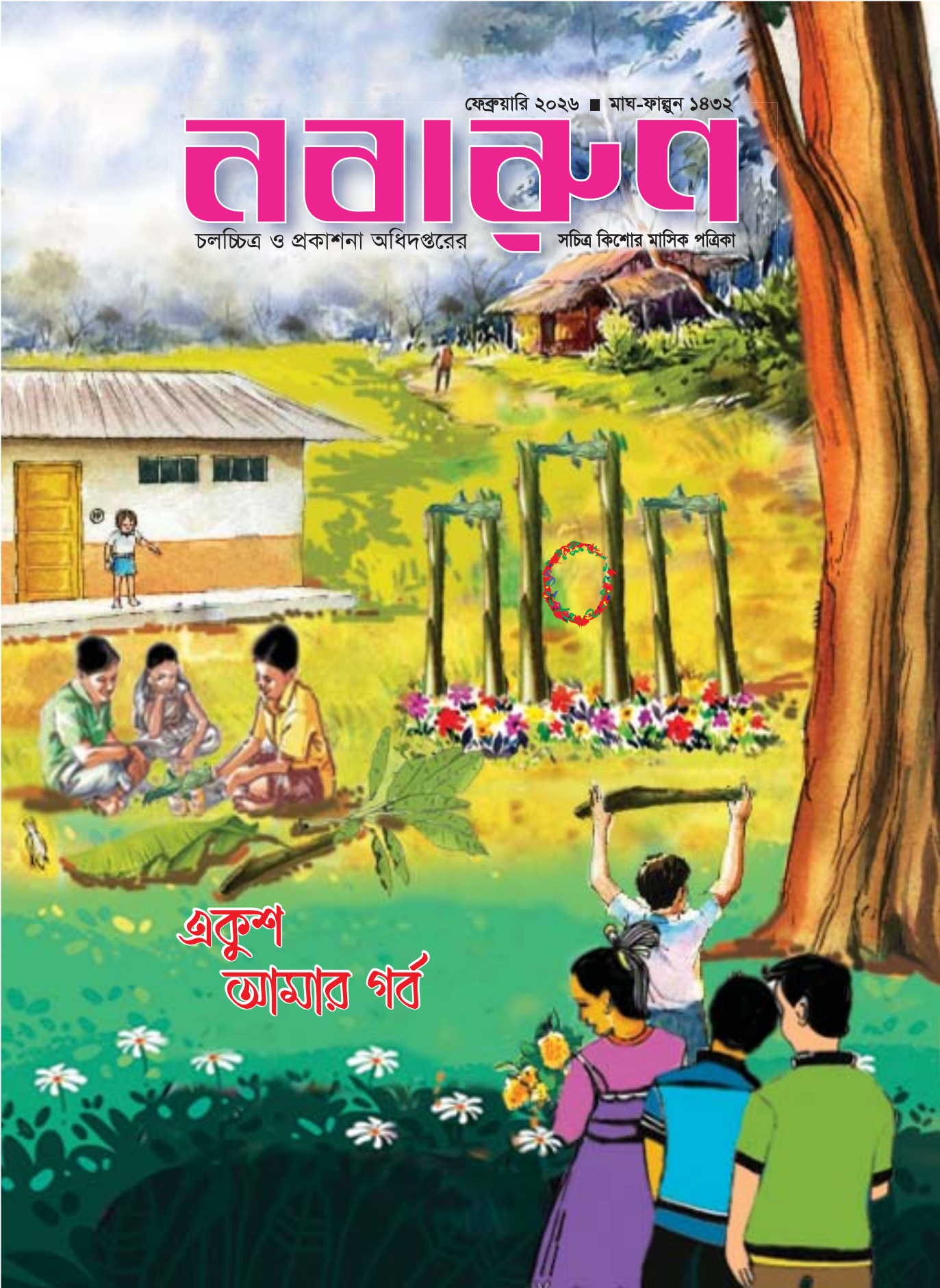
ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

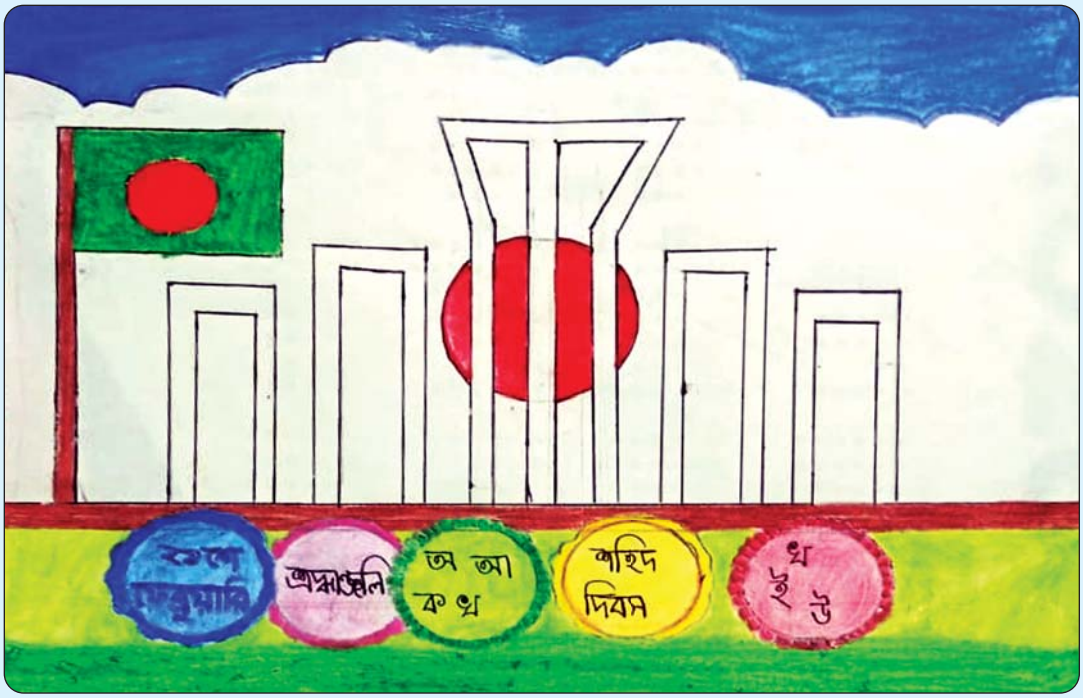
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা



একুশ আমার গর্ব



আয়ান হক ভূঁঞা, ষষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



রিজওয়ান আল রাহাত, সপ্তম শ্রেণি, মানিকনগর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষায় কথা বলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেকে শহিদ হন। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার।

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের মানুষের নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সেই থেকে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। তাই পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে–এটাই প্রত্যাশা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
☎ ০২-৮৩০০৬৮৮
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ মায়ের মমতায় মাতৃভাষা
প্রফেসর মো. সিরাজুল ইসলাম

১৩ শব্দের অর্থ কীভাবে বদলে যায়/ তারিক মনজুর

৩৬ আমার লাইব্রেরি আমার বন্ধু
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

৪৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ সুমন প্রামানিক

৫২ বাংলা ও বিশ্বের হাজারো ভাষা/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৫৬ এক শহরের দুই ভাষা/ মো. মাজহারুল ইসলাম

৫৯ বসন্তের আগমনে/ সাফায়েত কবীর

গল্প

০৮ আ-মরি বাংলা ভাষা/ রফিকুর রশীদ

১৬ শহিদমিনারের জন্য/মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

১৮ যে ভাষা খাঁচায় বন্দি/ তৌসিফ হাসনাত আনান

২২ চন্দ্রবিন্দু হাসছিল/ আলমগীর কবির

২৫ ভাষার তৃপ্তি/ আঞ্জুমন আরা

২৭ আমার ভাষা আমার মা/ জুয়েল আশরাফ

৩০ ফেব্রুয়ারির ফুল/ ইভা জান্নাত শহিদা

৩২ একুশ আমার গর্ব/ শারমিন নাহার ঝর্ণা

৩৯ রক্তে কেনা মাতৃভাষা/ ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

৪৮ একুশের মিছিল/ আনোয়ারুল ইসলাম

৫০ বাংলা ভাষার গল্প/ জাকির সেতু

প্রতিবেদন

৫৪ অন্যরকম ভালোবাসা/ শাহানা আফরোজ

৬২ সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

কবিতাগুচ্ছ

০৭ দেলওয়ার বিন রশিদ

২১ গোলাম নবী পান্না

২৬ মো. সাদেকুল ইসলাম

৩৪ নাহার আহমেদ

৩৫ বদরুল হক/ খায়রুল আলম রাজু
মো. ফারুক আহমেদ

৪৪ হানিফ রাজা/ মো. মাহফুজুল ইসলাম

৪৫ নকুল শর্ম্মা/ মমতা মজুমদার

৫৫ মাসুম আওয়াল/ মো. ইউনুছ আলী/ মো. রিফাত হাসান

ছোটোদের ছড়া

২১ আকিবা আনাম/ শরিফা আখতার শিউলি

২৪ মো. ফোয়াদ হাসান

৩৪ মো. মাহমুদুল হাসান/ অরিজিৎ পোদ্দার আর্দ্র

৬১ কায়নাত মারিয়া প্রাপ্তি/ কাজী জাবির আহমেদ
রোকেয়া আক্তার (সাথি)

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আয়ান হক ভূঁঞা/ রিজওয়ান আল রাহাত

তৃতীয় প্রচ্ছদ : আবু হানিফ/ তাসনিম জাহান রাদিয়া

শেষ প্রচ্ছদ : রুতবাহ জামান

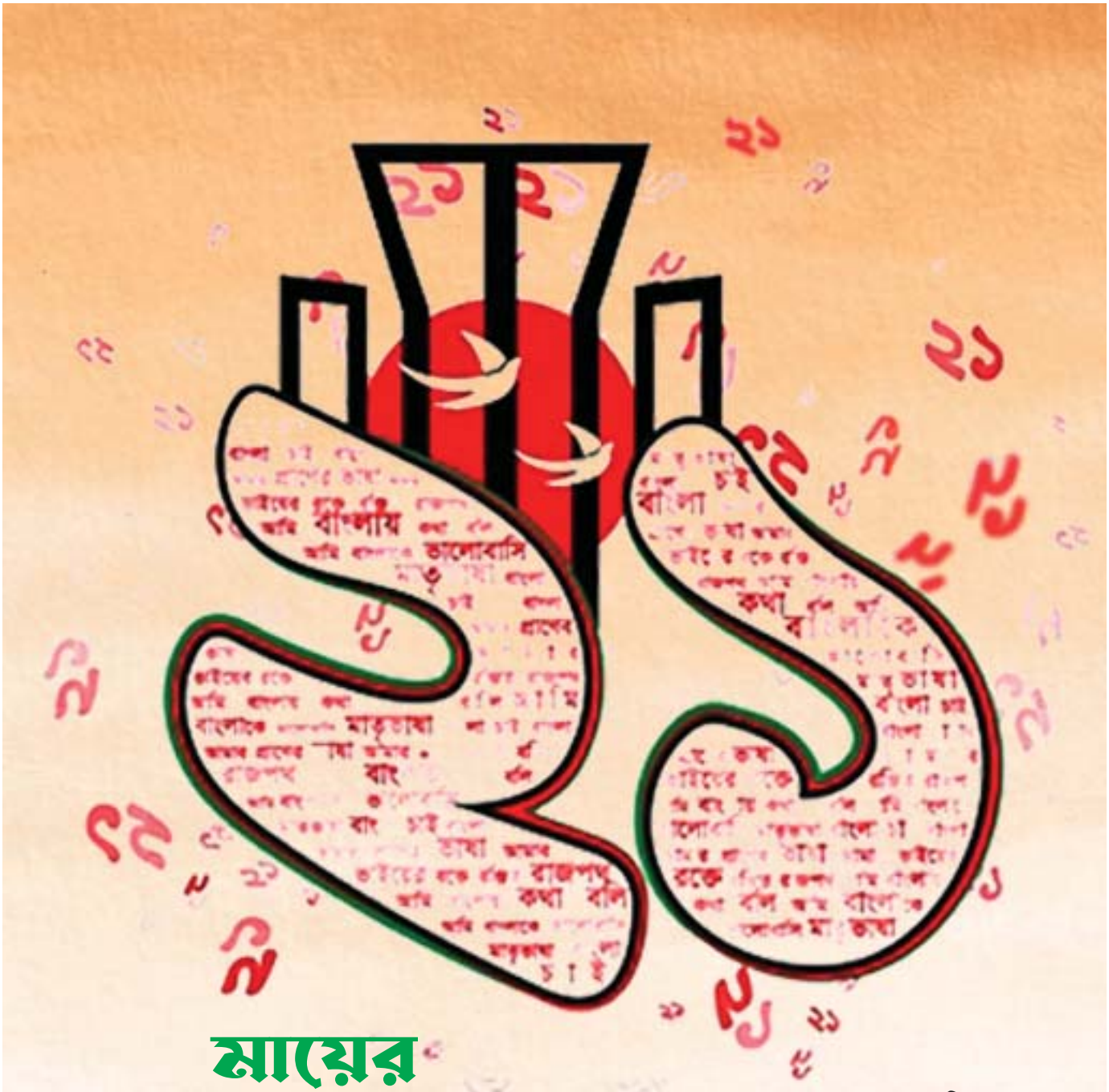
৬৩ রায়ানা সানিয়াত/ মেহরাব হাসান জারিফ

৬৪ মো. সিয়াম হোসেন/ রহমাতুল আলম

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd



মায়ের মমতায় মাতৃভাষা

প্রফেসর মো. সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, বলো তো আমরা কোন্ ভাষায় কথা বলি? বাংলা ভাষায়।

আমাদের দেশের নাম কী? বাংলাদেশ। খেয়াল করেছো? আমাদের ভাষার নামে দেশের নাম হয়েছে।

ভাষার নামে দেশ একটাই। সে হলো আমাদের বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী দেশও একটি—বাংলাদেশ। আর যে ভাষা রাষ্ট্রীয় সব কাজে ব্যবহার করা হয় তাই তো রাষ্ট্রভাষা।

আবার শোনো,

আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ...

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে...

ঐ দেখা যায় তালগাছ,ঐ আমাদের গাঁ...

একদেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল সাত রানি...

এইসব গল্প-ছড়া কার কাছে শুনি? মায়ের কাছে। গল্পগুলো দাদু-নানুর কাছেও শুনি।

তবে মায়ের কাছেই আমাদের ভাষা শেখা শুরু। যাঁর গর্ভে আমার জন্ম,সে আমার মা। মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করি, ছোট্ট বেলায় মায়ের দুধপান করি। মায়ের আদরে আহ্লাদে বড়ো হতে থাকি। মায়ের মুখের বুলি শিখি। মায়ের ভাষায় মন গড়ি। মায়ের মুখ থেকে শুনে শুনে যে ভাষা আমরা শিখি, সেটাই আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় কথা বলেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। আমরা মাকে যেমন আপন করে নেই পরম ভক্তি করি,ভাষাও তেমনি। মায়ের ভাষার সাথে রয়েছে স্বদেশের মর্যাদা। যে ভূখণ্ডে আমার জন্ম, সেটাই আমাদের মাতৃভূমি। প্রিয় স্বদেশ। মা, মাতৃ ভাষা, মাতৃভূমি এই তিনটি আমাদের পরম গর্বের বিষয়। তিনটি শব্দের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 'মা' কথাটি। মা যেমন তার সন্তানের কাছে শ্রদ্ধা,সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র, তেমনি একটি জাতির কাছে তার ভাষা, দেশও শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভালোবাসার বস্তু। আমরা তাই নিজের ভাষা ও দেশকে নিজের মায়ের মতোই দেখবো।

স্বদেশের ভাষা ও মর্যাদা রক্ষা মানেই মায়ের মর্যাদা রক্ষা করা। মাতৃভাষার সম্মান এবং মাতৃভূমির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিটি জাতিকেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া মাতৃভূমি সমৃদ্ধ হয় না।

মাতৃভাষা দিবসে শহিদমিনারে ফুল দিয়ে আমরা শুধু একটা অনুষ্ঠান পালন করি। এতে মায়ের ভাষার যত্ন সম্পূর্ণ হয় না। মায়ের ভাষার যত্নে ভাষাকে মমতার সাথে ব্যবহার করতে হয়।

সহপাঠী বন্ধুরা ভেংচি কেটে বিকৃত করে তোমাকে ডাকতে থাকলো অন্যদের সামনে। তখন তোমার কেমন লাগবে বলো তো? ভীষণ খারাপ লাগবে, তাই না? আবার কেউ অশিষ্ট বাংলায় বন্ধুদের মধ্যে গালমন্দ শুরু করে দিল। তখন নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। রাগ করবে। সুন্দর করে না ডাকলে তোমার যেমন বিরক্তি লাগে,মান মর্যাদায় আঘাত লাগে, ভাষারও তেমনি মর্যাদা আছে,তারও জাত আছে। ভাষার আর শব্দের নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। নিজস্ব মাধুর্য আছে।

আবার ভাবো তো, স্কুলের নির্ধারিত পোশাক না পড়েই তুমি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বসেছো। তোমার শ্রেণিশিক্ষক তোমাকে তখন কী বলবে বলো তো? তোমাকে ক্লাসে থাকতে দেবে? না। কারণ সেখানে পোশাকের নিয়ম রক্ষা কর নাই। সৌজন্য সভ্যতা-ভদ্রতা মেনে না চললে আমরা সবখানে মিলতে পারবো না। তেমনি ঘরে বাইরে স্কুলে আমরা ভাষাকে সুন্দর করে না বললে ভাষাকে অপমান করা হয়। যারা শোনেন তারাও বিরক্ত হন। পরীক্ষার খাতায় ভাষাকে ভালো করে না লিখলেও ফল ভালো আসবে না।

ইংরেজিতে ভালো নম্বর পেলে আমরা খুশি হই। অথচ বাংলাবিষয়ে তেমন বেশি নম্বর পাই না,কারণটাও খুঁজে দেখেছি কখনও? চুপটি করে বলি বাংলা ভাষাও আমাদের শিখতে হয়। না শিখলে তো ভালো ভাবে আয়ত্ত করা যায় না।

ভাষাকে শুদ্ধভাবে শেখার জন্য আগে সুন্দর উচ্চারণ শিখতে হয়। ভালো করে কথা বলতে হয়। ভাষা শেখার জন্য স্কুলের স্যার, ম্যামদের অনুসরণ করতে হয়। গল্প, কবিতা, ছড়ার প্রচুর বই পড়তে হয়। সুন্দর সুন্দর শব্দ জানতে হয়। বাংলা বানানের প্রতি যত্নবান হতে হয়।

প্রাণী পাখিরাও তাদের ভাষায় কথা বলে। নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। গোটা দুনিয়ায় একই প্রাণী পাখির ভাষায় কোন তফাৎ নেই। মানুষের ভাষায় আছে বৈচিত্র্য। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মাতৃভাষা ভিন্ন। সেই ভিন্নতাই গৌরবের। নিজস্ব ভাষাই তাদের

সম্পদ। সে সম্পদকে ধরে রাখতে তারা সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে। বন্ধুরা আমাদের মাতৃভাষাও আমরা গর্বের ধন হিসেবে লালন করবো।

আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে মোগল আমলে আমাদের দেশে ফারসি ছিল রাষ্ট্রভাষা। ইংরেজরা শাসন শুরু করলো। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) সেসময় মক্তবে ফারসি শিখেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় ফারসির অনুরাগী ছিলেন। ১৮৩৬ সালে রাষ্ট্রভাষা হলো ইংরেজি। বেগম রোকেয়ার (১৮৩২-১৯০৯) পরিবারে ফারসি ভাষায় লেখাপড়া হতো। তাঁরা উর্দুতে কথা বলতেন। অদম্য ইচ্ছায় বড়োবোন আর বড়োভাই এর কাছে গভীর রাতে বাংলা শিখতেন রোকেয়া। তাঁর বাবার চোখ এড়িয়ে। এদেশের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলায় বই লিখে মেয়েদের জাগিয়ে তুলেছেন।

সেই বাংলা ভাষার জন্য বাংলা মায়ের দুঃসাহসী ছেলেরা ১৯৫২ সালে রক্ত দিল। তাঁরা হলো ভাষা শহিদ। ১৯৫৩ সালে বাংলা পেলো রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। মাতৃভাষার যত্ন, চর্চা এবং অনুশীলন ছাড়া কোনো জাতি অগ্রসর হতে পারে না,বাঙালি জাতির জন্যও কথাটা খাটে।

মায়ের ভাষা বাংলাকে আমরা আজও যথাযথ সম্মান দিতে শিখিনি। আমাদের দেশের কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন,বাংলাভাষা চর্চায় আধুনিক হওয়া যায় না। উন্নতমানের চাকরি পাওয়া যায় না। দেশের বাইরে এ ভাষার কোনো গুরুত্ব নাই। মনের সংকীর্ণতায় অবাস্তব এইসব স্বপ্ন কল্পনা করি আমরা। শৈশবের শুরুতে ইংরেজি শেখাতে চাচ্ছি আমরা। আমাদের শিশুরা তা ঠিকঠাক মতো শিখতে পারছে না। অন্যদিকে ভুলে যাচ্ছে মায়ের ভাষা।

দু'শো বছর আগের ঘটনা। কবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) যশোরের জমিদার পরিবারে তুখোড় মেধাবী মানুষ ছিলেন। তিনি ভাবলেন বাংলায় কবিতা লিখে সুখ্যাতি হবে না। তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে ফ্রান্সে গিয়ে ইংরেজিতে কবিতা লেখা শুরু করলেন। সেখানে নাম-যশ তো দূরের কথা মোটেও ঠাঁই পেলেন না। আফসোস করে আবার বাংলায় লেখা শুরু করেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাংলা মাতৃভাষা নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন এইভাবে,

'হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।

বাংলামায়ের মাতৃভাষার অমূল্য সম্পদ ফেলে ভিন্ ভাষায় ভিক্ষার হাত বাড়িয়েছেন। লিখেছিলেন, 'খেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন'। অনিন্দ্য সুন্দর পদ্মফুল ফেলে দিয়ে জলজ শ্যাওলা নিয়ে খেলা করেছি।

ভাষা টিকে থাকে আমাদের গল্প-কবিতায়। ভাষার চর্চা হয় আমাদের রোজকার কথাবার্তা, নাটকে,



গানে, আকাশ-সীমায় লেখা মেসেজ বার্তায়। ভাষার দূষণ আর বিকৃতিও ঘটে সংস্কৃতি বিনোদনে। হাতের ডিভাইসে আসক্তিতে। মনের খিদে মিটাতে গিয়ে ভাষাকে যেন নষ্ট না করি। ভাষার প্রতি দরদ যেন হারিয়ে না ফেলি। এসব বিনোদনে, যোগাযোগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যেন মায়ের ভাষাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করি। ভাষা শিখবো বই থেকে, শিক্ষকের কাছ থেকে। ঘরে পরিবারে, মা বাবারও সতর্কভাবে কথা বলতে হবে।

এই প্রজন্মের তোমরা ভার্চুয়াল পর্দার খেলা নিয়ে মগ্ন থাকতে পছন্দ করো। ফেসবুক, ইউটিউব দেখে, টিভি সিনেমার ভার্চুয়াল কালচারে বেড়ে উঠছো। যাকে-তাকে মামা ডাকছো,আংকেল আন্টি ডাকো। দৈনন্দিন কথায়, নাটকে, ফেসবুকের লেখায়, এভাবেই অপব্যবহারে ভাষা রক্তাক্ত হচ্ছে- দূষিত হচ্ছে।

ব্যান্ডের গান শোনো। অসুবিধা নাই। তবে দেশি গান বাদ দিয়ে নয়। তোমাদের অনেকেরই কে পপ ভালো লাগতে পারে। তোমরা দেখো। খেয়াল রাখতে হবে,বাংলাভাষা পৃথিবীর অন্যতম মধুরতম ভাষা। কথাটা আমার নয়, বিদেশি অনেক ভাষা গবেষকের। একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গায়, এ গানের সুরের মূর্ছনায় হৃদয় ছুঁয়ে যায়। খোকন সোনা বলি শোনো, থাকবে না আর দুঃখ কোনো, মানুষ যদি হতে পারো...। ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে, ধূ ধূ বালুচরে পাখিদের নীড়ে, তুমি আমি লিখি প্রাণের বর্ণমালা, অথবা মধুর আমার মায়ের হাসি... এগুলোর প্রতি সম্পর্ক ছিন্ন করে নয়। বাংলা মায়ের মেঠোসুর যতটা সুরেলা, অত সুরেলা গান অন্য ভাষায় নেই। হিন্দি, আরবিতে থাকলেও আর কোনো ভাষায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাকে ছেড়ে আমরা তো খালামণিকে বেশি পছন্দ করি না। মায়ের আসনে খালামণিকে বসাতে পারি না, তাই না? সংস্কৃতির সাঁকো বেয়ে আসা ভাষার প্রতি ভালোবাসার বেলায়ও তাই।

বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যবহার রীতি, সৌন্দর্য রয়েছে। তারিখ উচ্চারণে ষোলো ডিসেম্বর, এক বৈশাখ, এগারো জ্যৈষ্ঠ বললেও ভাষার অপচর্চা ঘটে। আমরা বলবো, ষোলোই ডিসেম্বর, পহেলা বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ।

নিজের নামটা, পদবিটা, বংশ মর্যাদাটা আমরা নিখুঁত ভাবে শুনতে চাই। সাজ পোশাকে সচেতন হই। ভাষাতে লোকের সভ্যতার মাপকাঠি, কথাও তেমনি। অন্যের কাছে নিজেকে সুন্দর করে তুলে ধরতে মধুরতম ভাষায় বলতে হবে। প্রচলিত কথায় 'ভাষা হচ্ছে চিন্তার পোশাক।' মার্জিত ভাষা সবাই পছন্দ করে। প্রশংসা করে। ঢং করে কথাবলা কেউ পছন্দ করে না।

বাবা-মা, বড়রা কথা বললেই, তাদের কথাকে অকারণ বকবক মনে করছো। ব্লা ব্লা ব্লা করে চেঁচিয়ে উঠছো। পরিস্থিতির বর্ণনায়, মেজাজের কথায় ভাইব হয়ে যাচ্ছে। উচ্ছাস হয়ে যাচ্ছে ইয়েট। ঘন্টার পর ঘন্টা অনলাইন চ্যাট এ ইমোজী দিচ্ছো, বাচাল স্বভাবের ইয়াপার হয়ে যাচ্ছো। বন্ধু মহলে আদরের নাম বা স্নেহ প্রকাশে 'পুকী' বলে চীৎকার করলেও, তোমাদের এগুলো আর গোপন থাকছে না। বড়োরাও এগুলো এখন বুঝতে শিখে যাচ্ছেন। তাদের কাছে তোমাদের স্কিবিডি আজব হাস্যকর লাগছে। ভাষার এ ধরনের চর্চা এক নতুন জানালা খুলে দিয়েছে,সন্দেহ নাই। তোমাদের সংক্ষিপ্ত করা ভাষাকে বন্ধুদের খোশ আলাপ,আড্ডার মাঝেই রেখে দাও। বাইরে বসার ঘরে সাজিয়ে রাখো। এসব ভাষাকে পড়ার ঘরে জায়গা দিও না। সবখানে ভাষাকে ইচ্ছেখুশি বদলে ফেলার অর্থ হলো ভাষার দূষণ, ভাষাকে আঘাত করা।

বাঁধ দিয়ে বাতাস রোধ করা যায় না। ভাষাকেও মিশ্রণ থেকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই। আঞ্চলিকতা থাকবে, বিদেশি শব্দ মিশবে। তবে নিজ ভাষার সবটুকু হারিয়ে নয়। ফারসি ভাষার ৫ হাজার শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে আছে, সেই অনেককাল আগে থেকে। ইংরেজি, উর্দু, আরবি, চীনা, পর্তুগীজ এমন অনেক ভাষা থেকে বাংলায় বিপুল শব্দরাজী এসে মিশেছে। বিদেশি ভাষাগুলো অতিথি হয়ে এসেছিল।

এখন বাংলা ভাষা পরিবারের সদস্য হয়েছে, বাংলাভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ভাষা যত যুক্ত হবে তত পরিশীলিত হবে। দূষণ করে নয় নোংরা করে নয়। শুদ্ধতা থাকতে হবে নিজেরটা অবিকল রেখে। দেশ আর ভাষার গর্ব নিজস্ব। অন্যের ভাষার ঠাঁট নিয়ে তো আমার গর্ব হতে পারে না।

চীন, জাপান, কোরিয়ার লোকেরা তো নিজেদের ভাষা মাধ্যমেই অধিকাংশ কাজ করছে। দক্ষিণ কোরিয়া ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। তারা বিদেশি ভাষার অনুবাদ করে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

মাতৃভাষার সাথে আরও কমপক্ষে দুটি ভাষা শেখা উত্তম। তাহলে আমরা বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে জায়গা করে নিতে পারবো। বৈদেশিক পড়াশুনায় ডিগ্রি নিতে, চাকরিতে কাজে লাগবে। উপার্জনে ভাষা এক মোক্ষম হাতিয়ার। ভিন দেশে প্রবাসে গিয়ে আমাদের স্বদেশিদের কাজ করতে সে দেশের ভাষা তাদের প্রধানতম উপায়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাকেও মর্যাদার সাথে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ইশারা ভাষাকেও সতর্কভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

মা স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে আমাদের আগলে রাখে সবসময়। মায়ের ভাষা আমাদের হৃদয় মনে সুধা ঢালে। বাংলা মায়ের ভাষায় আমাদের আনন্দ বেদনা,সুখ শান্তি সব লুকিয়ে থাকে। অন্য কোনো ভাষায় প্রাণখুলে মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাংলাভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের তাই ভাষার প্রতি মর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে হবে। যেমন করে মূল্যবান বস্তু রাখি আলমিরাতে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রাখি ভক্তিতে। বন্ধুরা এসো আমরা মায়ের ভাষাকে মমত্ব দিয়ে আগলে রাখি। ভাষার ব্যবহারে, কথায়, লেখায়, উচ্চারণে। ❑

তথ্যসূত্র:
বিভিন্ন তথ্যসূত্র এবং লেখক ভাবনা অবলম্বনে

অধ্যাপক (অব.), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি বিএল. কলেজ, খুলনা



শহিদমিনার

দেলওয়ার বিন রশিদ

শহিদমিনার তুমি আমার
চোখের জলে আঁকা
শহিদমিনার তুমি আমার
প্রিয় ফুলের ঢাকা।

শহিদমিনার তুমি আমার
নতুন স্বপ্ন আশা
শহিদমিনার তুমি আমার
অফুরান ভালোবাসা।

শহিদমিনার তুমি আমার
গান কবিতা ছড়া
শহিদমিনার তুমি আমার
হৃদয় দিয়ে গড়া।

শহিদমিনার তুমি আমার
দুঃখ ছোঁয়া বাঁশি
শহিদমিনার তুমি আমার
বর্ণমালার হাসি।

গল্প

আ-মরি বাংলা ভাষা

রফিকুর রশীদ



দাদুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সবার আগে স্পর্শ বলে ওঠে,

'আমি অংশ নেব দাদুভাই।'

দাদু খুব খুশি হন। আবার একটু অবাকও হন,

'সত্যি অংশ নিবি তুই?'

এবার তীর্থ, স্বর্গ, তিথি, মম একযোগে হইহই করে জানায়,

'আমরা সবাই যাব তোমার ইশকুলে। সবাই অংশ নেব অনুষ্ঠানে।'

দাদু আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে সব কটা নাতি-নাতনিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চান। কর্মজীবনের একেবারে শেষবেলায় এসে নিজের নাতি-নাতনির ক্ষুদে বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যাবার কথা ভাবতেই মন ভরে যায় খুশিতে। সত্যিই এমন আনন্দ আগে কখনো পাননি তিনি। আনন্দে চোখের কোনা ভিজে আসে। এরই মাঝে স্পর্শ এসে কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে,

'অংশ দাও দাদুভাই!'

এ কথা শুনে সবাই একযোগে হো হো করে হেসে ওঠে। নাতির মাথায় হাত রেখে বলেন,

'এখনই অংশ নিবি?'

'হ্যাঁ, এখনই দাও।'

স্পর্শের কথা শুনে দাদু বেশ জব্দ হন। নাতির হাতে এখন কী দেবেন ভেবে পান না। তীর্থ এগিয়ে এসে ছোটো ভাইকে ধমকানি দেয়,

'অংশ নেওয়া কাকে বলে জানিস?'

অবুঝ আবদার তার,

'আমি অংশ নেব। হুঁ।'

দুই

স্পর্শকে নিয়ে এই এক ঝামেলা হয়েছে। সে বাঙালির ছেলে হয়েও বাংলা ভাষাটা ঠিকঠাক বোঝে না। সব শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না। তার বয়স সাত। পনেরো বছরের তীর্থও অপ্রচলিত কিংবা কমপ্রচলিত শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। কথকের মুখের দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বুঝতে চেষ্টা করে। স্পর্শ সেটুকুও পারে না। আজন্ম দেশের বাইরে থাকার কারণে ওদের এই অবস্থা হয়েছে। মা-বাবা দুজনেরই কর্মস্থল জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায়। বাসায় মা-বাবার সঙ্গে ঠিকই মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলে ওরা, দাদু-নানুর সঙ্গেও ফোনে কথা বলে বাংলাতেই, কিন্তু বাসার বাইরে সারাক্ষণ চলে ইংরেজি। রাস্তায়, স্কুলে কিংবা মার্কেটে সর্বত্রই ইংরেজি। এমনকি বাসায় যে সাহায্যকারী এবং বাগানের মালি আছে তাদের সঙ্গেও ইংরেজিতেই কথা বলতে হয়। তারা দুজনেই স্থানীয় মানুষ, তাদের নিজস্ব ভাষাও আছে, লেখাপড়া বিশেষ একটা জানে না, কিন্তু ইংরেজি বলে চমৎকার। এমন পরিবেশের কারণে তীর্থ এবং স্পর্শ ইংরেজিটা যত সাবলীলভাবে শিখেছে, বাংলা ভাষা সেভাবে শেখা হয়নি। মা-বাবার মুখে শোনা আর ছুটির দিনে বেশ কয়েকটি বাঙালি পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা – এর মধ্যেই চলে তাদের বাংলা চর্চা। কখনো কখনো দুর্বোধ্য কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিস্তর হাসাহাসিও হয়।

বাংলা ভাষার দেশ বাংলাদেশে তীর্থ আরো দু'বার এলেও স্পর্শের আগমন এবারই প্রথম। সব কিছুতেই বিপুল কৌতূহল। ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পর স্পর্শই চিৎকার করে ওঠে আনন্দে,

'এই আমাদের বাংলাদেশ!'

বাবার আগে মা-ই জবাব দেয়,

'হ্যাঁ, এটাই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।'

'এই ঢাকাতেই আমরা এখন ছোটো কাকুর বাসায় যাব।'

তীর্থ আরো নিশ্চিত করতে চায়,

'স্বর্গদের বাসায়, তাই তো বাবা?'

স্পর্শ জানতে চায়,

'দাদুবাড়ি যাব কখন তাহলে?'



মা জানায়, 'সে তো মেহেরপুর। ঢাকা থেকে অনেক দূর।'

বাবা আশ্বস্ত করে, 'যাব যাব। স্বর্গদের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে যাব। এখন চলো, বাইরে তোমাদের কাকু এসে দাঁড়িয়ে আছেন।'

তিন

এয়ারপোর্ট থেকে উত্তরা, সামান্য দূরত্ব। কিন্তু মূল রাস্তাটায় উঠেই যানজট। গাড়ির হর্ন বাজছে বেপরোয়াভাবে। তীব্র শব্দে চমকে ওঠে তীর্থ-স্পর্শ। বিরক্তও হয়। বাবা বুঝিয়ে বলেন,

'এই আমাদের ঢাকা। লুসাকার মতো ফাঁকা শহর নয়। এই রকমই চলবে এখন।'

ভিড় ঠেলে বাসায় পৌঁছুনোর পর সবাই আনন্দে হইহই করে ওঠে। পাঁচ বছরের স্বর্গ ভিডিও-কলের ছবিতে দেখা দুই ভাইকে কাছে পেয়ে মহাখুশি। প্রথমে একটুখানি লাজুক লাজুক ভাব দেখালেও কয়েক মিনিটের মধ্যে মিলেমিশে একাকার। বয়সে সবার ছোটো, অথচ তার ব্যস্ততাই যেন সবচেয়ে বেশি। কতরকম প্রশ্ন তার! আর কারণে-অকারণে তিড়িংবিড়িং লম্ফঝম্প। তার সংগ্রহের সব খেলনাপাতি দুই ভাইকে দেখিয়ে সে আনন্দ পায়। মায়ের কাছে শেখা 'আতাগাছে তোতাপাখি', 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'সহ বেশ ক'টা ছড়া সে গড়গড় করে শুনিয়ে দেয়। দুই ভাই হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেয়। স্পর্শ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আগডুম বাগডুম মানে কী?'

এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাবে স্বর্গ? দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছে জানতে চায়। তার হাতে অনেক কাজ। ছেলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায়! খুব সহজ পরামর্শ দেয়, 'ভাইদের সঙ্গে এখন খেলা করো গে যাও।'

পরদিন সকালে ঢাকা থেকে মাইক্রোবাসে মেহেরপুরে যাবার পথে বাংলা শব্দ নিয়ে আবারও বিপাকে পড়ে স্বর্গ। সবাই তার কাছে গান শুনতে চায়। গান কোথায় পাবে সে! সদ্য স্কুলে শেখা জাতীয় সঙ্গীতটি সে গাইতে চেষ্টা করে। 'মা তোর বদনখানি' পর্যন্ত গাওয়া হতেই স্পর্শ জিজ্ঞেস করে, 'বদন মানে কী?'

মায়ের মুখ মলিন হলে সব সন্তানেরই মন খারাপ হয়, কান্না আসে। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলে কাকু, দেশও হচ্ছে মায়ের মতো। আমরা সবাই সেই

মায়ের সন্তান। দেশের দুঃখকষ্ট দেখলে আমরা সবাই 'নয়নজলে ভাসি।' তীর্থ এবং স্পর্শের খুব ভালো লাগে কাকুর কথা শুনতে। কাকু ভালোভাবে বুঝিয়ে বলে, 'প্রয়োজনে দেশের বাইরে বাস করলেও তোমরা এই দেশেরই মানুষ, তোমাদের পরিচয় বাঙালি।'

চার

মেহেরপুর বললে কী হয়, ওদের দাদুবাড়ি আরো মাইল দশেক দূরে। গ্রামের নাম চন্দ্রবাস। ভারতীয় সীমান্তের গা-ঘেঁষা ছোট্ট গ্রাম। দাদুবাড়ি গিয়ে ওরা পেল তিথি এবং মর্মকে, দুটোই ফুপাতো বোন। দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওদের ফুপু আগেই হাজির বাপের বাড়ি। বড়ো ভাই বাড়ি আসছে দশ বছর পরে, সঙ্গে ছোটো ভাইও – এ খবর শুনে কোনো বোন স্থির থাকতে পারে! সহসা আকবর মাস্টারের বাড়িতে বসে যায় চাঁদের হাট।

চন্দ্রবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি অবসরে যাবেন এ মাসের পঁচিশ তারিখে। তার আগে আছে একুশে ফেব্রুয়ারি। না, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একুশের অনুষ্ঠান সেভাবে পালিত হয় না বললেই চলে। আকবর মাস্টারের খুব সাধ হয়েছে কর্মজীবনের শেষপ্রান্তের এই একুশে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠান করবেন। নিজেদের স্কুলে শহিদমিনার নেই তাতে কী, পার্শ্ববর্তী হাই স্কুলের শহিদমিনারে ফুল দেবেন, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা এবং গানের অনুষ্ঠান করবেন। আবার তাঁর বিদায় উপলক্ষেও বিশেষ অনুষ্ঠান হবে স্কুলে। আকবর মাস্টার নিজের নাতি-নাতনিদেরও এই দুটো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সবার আগে স্পর্শ জানায়, সে অংশ নেবে। হাত পেতে কোনো জিনিস নেওয়া আর কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া যে এক নয়, সে কথা স্পর্শকে বুঝানোর জন্য ইংরেজি ভাষার সাহায্য নিতেই হয়। 'পার্টিসিপেশন' বলতেই সে বেশ বুঝতে পারে এই অংশগ্রহণটা কী রকম। সিদ্ধান্ত হয়, স্কুলের দুটো অনুষ্ঠানে শুধু স্পর্শ নয়, তারা সবাই সানন্দে অংশ নেবে।

পাঁচ

ফেব্রুয়ারি মাস বাঙালির কাছে আসে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে। গাছে গাছে নতুন পাতা নতুন ফুলের সমাহার। পাখির কণ্ঠে বসন্তের গান। একুশের আয়োজনে ব্যস্ত শহর-নগর-গ্রাম। আকবর মাস্টারের বাড়িতেও শুরু হয় অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ রিহার্সেল। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, মোদের গরব মোদের আশা, ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়... আরো কত আবৃত্তি, গান! এইসব তোড়জোড় দেখে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকেও নানান বয়সের শিশু এসে জুটে যায়। তারাও অংশ নেবে একুশের অনুষ্ঠানে। সত্যি সত্যি ভরা পূর্ণিমার চাঁদের হাট বসে যায় আকবর মাস্টারের বাড়িতে। সবাই তীর্থ এবং স্পর্শের ভাষাজ্ঞান দেখে বড্ড মজা পায়। বাঙালির ছেলে হয়েও তারা থাকে বাংলার বাইরে। দুই ভাই মাঝেমধ্যেই নিজেদের মধ্যে ধুমসে ইংরেজিতে কথা বলছে। ক'জন বুঝবে সেই ইংরেজি! অন্য সবার সঙ্গে তারা বাংলাতেই কথা বলছে, গান শিখছে। কিন্তু কথা বলতে বলতে তারা অনেক সময় হোঁচট খায়, লজ্জা পায়, একটু মন খারাপও করে। গান গাইতে গিয়ে সব শব্দের মানে জানতে চাইলে চলে! স্পর্শের কৌতূহল বেশি। সে জানতে চায় 'মোদের' মানে কী, 'গরব' মানে কী! আরো কত প্রশ্ন!

প্রশ্ন শুনে আকবর মাস্টার খুব খুশি হন। তিনি নাতি-নাতনিদের মাথায় হাত রেখে আনন্দের সঙ্গে বলেন,

'ভেরি গুড! একুশ আমাদের এভাবেই প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে।'

দাদুর হাতের আঙুল ধরে তীর্থ বলে ওঠে,

'ভেরি গুড বললে যে দাদু! ওটা ইংরেজি নয়?'

'হ্যাঁ, ইংরেজি। কোনো ভাষাই আমাদের শত্রু নয়। আর ইংরেজি তো নয়ই।'

দাদুর কথা শেষ না হতেই তীর্থ আবার প্রশ্ন করে,

'বাঙালি তো বাংলা ভাষার জন্যেই লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে, তাই না?'

‘তা ঠিক। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা।’ দাদু সহজ করে বুঝিয়ে বলে, ‘বাঙালি চেয়েছে – পৃথিবীর সব মানুষের মাতৃভাষার অধিকারের কথা বলতে। ইউনেস্কো সেটা মেনেও নিয়েছে। সেই জন্যে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।’

ছয়

আবৃত্তি শেখার সময় সমস্যা দেখা গেল তীর্থ আর স্পর্শকে নিয়ে। বাংলা বর্ণমালা ওরা চেনে না। বই দেখেও কবিতা পড়তে পারে না। তাহলে কবিতা মুখস্থ হবে কী করে! বারবার না পড়লে তো হবে না! শেষে জোড়াতালি দিয়ে এক রকম সমাধান করা হলো। এগিয়ে এলেন আকবর মাস্টার। বাংলা কবিতা ইংরেজি অক্ষরে লিখে দিলেন। তাই দেখে দেখে তীর্থ ও স্পর্শ দিব্যি উচ্চারণ করে– ‘ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ দুপুর বেলার অক্ত / বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়? বরকতেরই রক্ত।’ ওদের উচ্চারণ শুনে কেউ কেউ খিলখিলিয়ে হাসে। তীর্থ-স্পর্শ লজ্জা পায়। তবু তারা চেষ্টা করে– ‘প্রভাতফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা...।’

দুই নাতিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দাদু বলেন,

‘এক মাস সময় পেলেই আমি কিন্তু পারতাম।’

ওদের বাবা জানতে চায়,

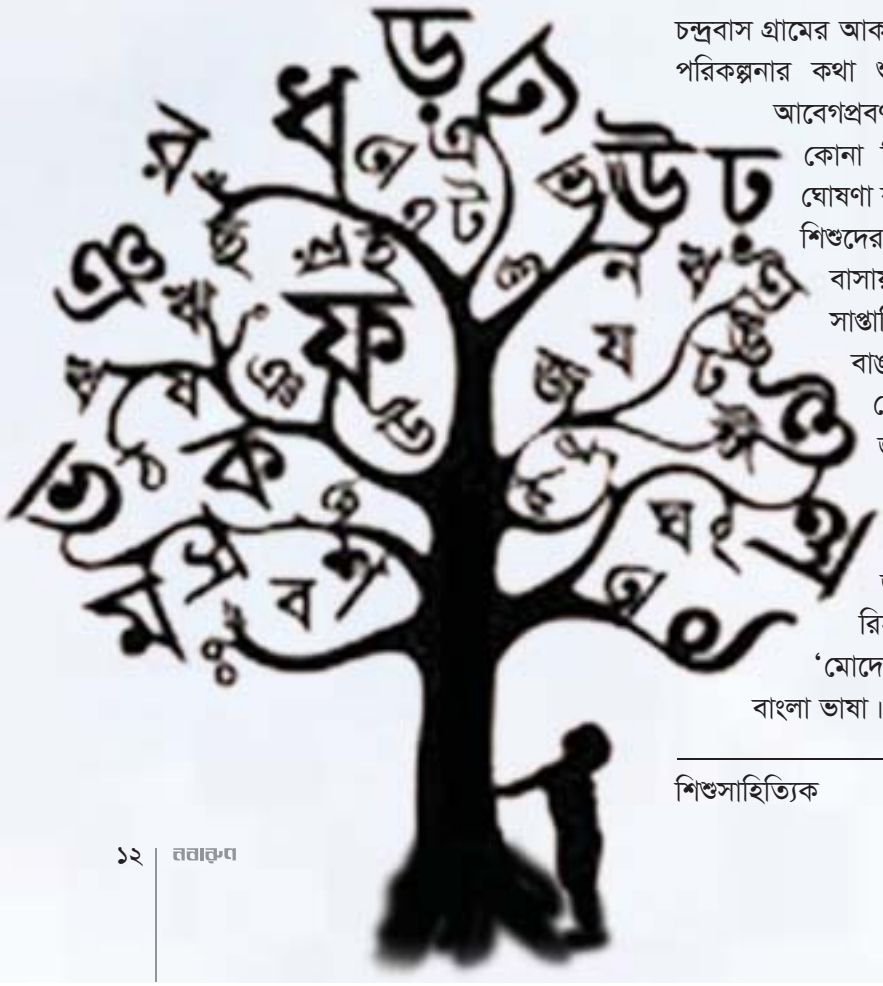
‘কী পারতেন আব্বা?’

‘বাংলা বর্ণমালা চিনিয়ে দিতে পারতাম। ওরা বাংলায় লিখবে, পড়বে।’

নাতিদের কথা বলতে বলতে আকবর মাস্টার তাঁর আগামী দিনের স্বপ্ন মেলে ধরেন। অবসরে যাবার পর এ গ্রামের প্রত্যেকটি শিশুকে তিনি হাতে ধরে ধরে অক্ষর চেনাবেন, বানান শেখাবেন। এ গ্রামের সবাই একদিন নিজের নাম নিজের হাতে স্বাক্ষর করতে শিখবে....।

চন্দ্রবাস গ্রামের আকবর মাস্টারের অবসর যাপনের পরিকল্পনার কথা শুনে তাঁর প্রবাসী পুত্রও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তার চোখের কোনা ভিজে আসে। চোখ মুছে সে ঘোষণা করে, প্রবাসী বাঙালি পরিবারের শিশুদের বাংলা শেখানোর জন্যে সে নিজ বাসায় ‘রবিবারের পাঠশালা’ খুলবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অন্তত দশটি বাঙালি শিশুকে বাংলা বর্ণমালা শেখাবে। দূর আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়াতেও উচ্চারিত হবে– ‘অ... আ... ক... খ...।’

আকবর মাস্টারের উঠোনে জড়ো হওয়া শিশুরা তখন রিহার্সেলে বসে কোরাস গাইছে– ‘মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।’ ❑



শিশুসাহিত্যিক

শব্দের অর্থ কীভাবে বদলে যায়

তারিক মনজুর

শের-এ-বাংলা মানে বাংলার বাঘ, এটা তো জানো। তবে 'শের' মানে আসলে বাঘ নয়। ফারসি ভাষায় 'শের' মানে সিংহ। তার মানে 'শের-এ-বাংলা' মানে হওয়ার কথা ছিল বাংলার সিংহ। তাহলে অর্থ এভাবে পালটে গেল কেন?

এক সময় সুন্দরবনে সিংহ ছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু সে অনেক আগের কথা। সে কথা মানুষ ভুলেও গেছে। সুন্দরবনের রাজা তাই বাঘ। আর বাংলাদেশে যেহেতু সিংহ নেই, তাই এখানে শের শব্দের অর্থ পালটে হয়েছে বাঘ।

আবার ইরানের একটি পুরনো ভাষা আবেস্তা। এই আবেস্তা ভাষায় 'মরেঘ' শব্দটি আছে। 'মরেঘ' শব্দটি ফারসি বা ইরানি ভাষায় হয়েছে মুর্ঘ। 'মুর্ঘ' শব্দটি বাংলা ভাষায় হয়ে গেছে মোরগ। তা, মোরগ তো সবাই চেনো। কিন্তু আবেস্তা ভাষায় 'মরেঘ' মানে যে -কোনো ধরনের পাখি। আর আমাদের বাংলা ভাষায় মরেঘ বা মোরগ বলতে ঘরে পোষা নির্দিষ্ট ধরনের পাখিকে বোঝায়।

আবেস্তা ভাষার সাথে বাংলা ভাষার বহু শব্দের মিল রয়েছে। যেমন, আমরা বাতাসকে বলি বায়ু। আবেস্তা ভাষায়ও বাতাসকে বলে বায়ু। আমরা আকাশের বিদুৎ চমককে বলি বজ্র, আবেস্তা ভাষায়ও বলে বজ্র। এ রকম শব্দের মিল বা শব্দের ধ্বনিগত মিল আরও অনেক দেখানো যাবে। তাই ভাষাপণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, আবেস্তা ভাষাও বাংলা ভাষার মতো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে এসেছে।

সংস্কৃত ভাষা আর গ্রিক ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে এসেছে। এ দুটি ভাষার মধ্যেও ধ্বনিগত আর শব্দগত মিল পাওয়া যায়। যেমন, সংস্কৃত 'ধুম' মানে ধূম্র বা ধোঁয়া। সংস্কৃত 'ধুম' আর গ্রিক 'থুমস' একই শব্দ থেকে এসেছে। গ্রিক 'থুমস' মানে আত্মা বা প্রাণ। আবার, সংস্কৃত 'আত্মা' আর গ্রিক 'আত্মস' একই শব্দজাত। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ ধোঁয়া বা বাষ্প।

এক ভাষার শব্দ কাছাকাছি ভাষায় কীভাবে বদলে যায়, সেটা একটা চমকপ্রদ ব্যাপারও বটে। আবার

একই ভাষার শব্দ সময়ের ফেরে বদলে যেতে পারে। যেমন ধরো, ইংরেজি 'বিড' শব্দটি। বিড শব্দের মূল অর্থ ছিল প্রার্থনা। মধ্যযুগে ব্যাপারটা এমন হলো যে, একবার প্রার্থনা শেষ করে ছোট্ট একটা কাঠের পুঁতি দিয়ে হিসাব রাখা শুরু হলো। তারপর পুঁতিগুলো সুতায় গেঁথে বানানো হলো তসবি। এভাবে 'বিড' শব্দের অর্থ বদলে গিয়ে হলো তসবি বা জপমালা।

কিংবা ধরো মৃগ শব্দটি। এককালে এর অর্থ ছিল পশু। যে কারণে পশুরাজ সিংহকে বলা হতো মৃগরাজ বা মৃগেন্দ্র। আর পশু শিকারকে বলা হতো মৃগয়া। কিন্তু দেখা গেল, রাজারা মৃগয়ায় গিয়ে বা পশু শিকারে গিয়ে মূলত হরিণ শিকারই করছেন। ফলে, মৃগ শব্দের অর্থ বদলে গিয়ে হলো হরিণ।

আবার 'অঞ্চল' থেকে এসেছে আঁচল শব্দটি। অঞ্চল বা আঁচল বলতে শাড়ির প্রান্তের অংশকে বোঝানো হয়। এখন অঞ্চল বলতে এলাকাও বোঝানো হয়। আবার সংস্কৃত 'ঘর্ম' শব্দের অর্থ গরম। আর বাংলায় ঘর্ম বলতে ঘাম বোঝায়। গরমে ঘামের কারণে শরীরে হয় ঘামাচি। ব্যাঙ থেকে যেমন ব্যাঙাচি, তেমনি নতুন তৈরি হওয়া আরেক শব্দ ঘাম থেকে ঘামাচি।

সমজাতীয় ভাষাগুলো একই অর্থে একটি শব্দ নাও ব্যবহার করতে পারে। যেমন, 'আদর' মানে স্নেহ, প্রীতি। গুজরাটি ভাষায় এই 'আদর' শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা বা সম্মান। অর্থাৎ, আমরা ছোটোদের আদর করি, ওরা বড়োদের আদর করে। আবার 'রাগ' শব্দের অর্থ ক্রোধ। অথচ সংস্কৃত ভাষায় 'রাগ' মানে প্রেম। কিংবা ধরো বাড়ি শব্দটি, এটি এসেছে 'বাটিকা' শব্দ থেকে। বাংলা ভাষায় বাড়ি মানে থাকার ঘর, আর গুজরাটি ভাষায় বাড়ি অর্থ বাগান।

শব্দের অর্থ থাকে, এটা তুমি জানো। কিন্তু একটা শব্দের কতগুলো অর্থ থাকে তা তুমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না। কারণ, একটি শব্দ ভাষায় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'পাতা' শব্দের কথাই ধরো। গাছের পাতা আছে, বইয়ের পাতা আছে, চোখের পাতা আছে, পায়ের পাতা আছে। এছাড়া পাতা শব্দের আরও অর্থ পাবে; যেমন – আসন পাতা, আড়ি পাতা, দই পাতা, হাত পাতা, ওত পাতা ইত্যাদি।

খেয়াল করো, গাছের পাতা আর বইয়ের পাতা এক নয়, আলাদা। কিন্তু এদের মধ্যে দারুণ এক সম্পর্ক আছে। এক সময়ে গাছের পাতায় লেখা হতো। 'চর্যাপদে'র নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো বইটি লেখা হয়েছে তালপাতার উপরে। পাতা শুকিয়ে তার উপরে লেখা হতো মধ্যযুগে। সেসব পাতা আবার সেলাই করে একসাথে গেঁথে রাখা হতো। এভাবে গাছের পাতা হয়ে গেল লেখার পাতা বা বইয়ের পাতা। আর পাতা গেঁথে বা গ্রন্থনা করে রাখা হতো বলে বইয়ের নাম হয়ে গেল 'গ্রন্থ'।

আবার ধরো 'পরশু' শব্দটি এসেছে পরশ্ব শব্দ থেকে। পরশ্ব মানে আগামীকালের পরের দিন। কিন্তু বাংলা ও হিন্দি ভাষায় পরশু বোঝাতে কেবল আগামীকালের পরের দিন নয়, গতকালের আগের দিনও বোঝায়। যেমন, কেউ যদি বলে 'আমি পরশু আবার আসব', তার মানে সে আগামীকালের পরের দিন আসবে। আবার যদি কেউ বলে 'আমি এর আগে পরশুদিনও এসেছিলাম', তার মানে সে গতকালের আগের দিন এসেছিল।

শব্দের অর্থ ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা হয়ে যেতে পারে। যেমন, একজন লেখকের কাছে 'কলম' মানে লেখার উপকরণ। আবার একজন চাষির কাছে কলম শব্দের অর্থ ভিন্ন। তিনি 'কলম' বলতে বিশেষভাবে তৈরি করা চারাগাছ বোঝান। আবার, 'বল' বলতে একজন বালক যা বুঝবে, পদার্থবিজ্ঞানে 'বল' বলতে তা বোঝানো হয় না। বালকের কাছে 'বল' হলো খেলার জিনিস। আর পদার্থবিজ্ঞানে 'বল' হলো বিশেষ ধরনের শক্তি।

কিংবা 'ধাতু' শব্দটির কথা ভাবো। ধাতু বলতে পদার্থবিজ্ঞানে যা বোঝানো হয়, বাংলা ব্যাকরণে ধাতু বলতে তা বোঝানো হয় না। পদার্থবিজ্ঞানে সোনা, রুপা, লোহা, এমনকি পারদও ধাতু। আর ব্যাকরণে ধাতু হলো ক্রিয়ার মূল; যেমন – কর্, খেল্, যা ইত্যাদি। ব্যাকরণের ধাতু বা ক্রিয়ামূল থেকে ক্রিয়া তৈরি হয়। খেল্ ধাতু থেকে খেলি, খেলো, খেলে, খেলেছি, খেলেছ, খেলেছে, খেলব, খেলবে, খেলেছিলাম, খেলেছিলে ইত্যাদি ক্রিয়া তৈরি হয়। আবার ধাতু থেকে নতুন শব্দও তৈরি হতে পারে। যেমন – খেলনা, খেলো, খেলানো, খেলুড়ে, খেলোয়াড় ইত্যাদি।

শব্দের অর্থ কখনো কখনো সংকীর্ণ বা সংকুচিত হয়ে পড়ে। যেমন– সেই 'মৃগ' শব্দের কথাই ধরো। আগে মৃগ মানে যে-কোনো পশুকে বোঝানো হতো। এখন মৃগ মানে শুধু হরিণকে বোঝায়, অন্য পশুকে বোঝায় না। কিংবা 'মোরগ' শব্দটি ধরো। আবেস্তা ভাষায় মরেঘ অর্থ যে-কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী। আর বাংলায় মরেঘ থেকে আসা মোরগ বলতে নির্দিষ্ট ধরনের প্রাণীকে বোঝায়। আবার, 'অন্ন' মানে আগে যে-কোনো ধরনের খাদ্যকে বোঝানো হতো। মিষ্টি খাদ্যকে বলা হতো মিষ্টান্ন, পল বা মাংস মেশানো খাদ্যকে বলা হতো পলান্ন। আর এখন অন্ন বলতে মূলত ভাতকে বোঝানো হয়।

শব্দের অর্থের বিস্তার বা সম্প্রসারণও ঘটে। যেমন, মীরজাফর ছিল ইতিহাসের একজন। কিন্তু এখন প্রতারক বা বিশ্বাসভঙ্গকারী বোঝাতে যে কাউকে 'মীরজাফর' বলা যায়। আবার, গঙ্গা একটি নির্দিষ্ট নদীর নাম। কিন্তু গঙ্গা থেকে উৎপন্ন শব্দ হলো গাঙ। গাঙ বলতে যে-কোনো নদীকে বোঝায়। ইংরেজি 'কম্পেনিয়ন' বলতে এক সময়ে বোঝানো হতো এমন ব্যক্তি, যার সঙ্গে রুটি ভাগ করে নেওয়া যায়। আর এখন কম্পেনিয়ন শব্দের অর্থ হয়েছে যে সঙ্গে থাকে, মানে সঙ্গী। এভাবে শব্দের অর্থের সম্প্রসারণও ঘটে।

শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। 'বর' শব্দটি খেয়াল করো। বিয়ের সময়ে কন্যাপক্ষ যাকে বরণ করে নেয়, তাকে বর বলে। 'বরণ' থেকে বর শব্দটি এসেছে। আবার 'পাত্র' মানে আধার বা ধারক, অর্থাৎ যাতে জিনিস রাখা হয়। বিয়ের আসরের বরকে তাহলে পাত্র বলে কেন? কারণ, তার কাছে কন্যাকে তুলে দেওয়া হয় বা রাখা হয়।

শব্দের কিছু ব্যতিক্রম প্রয়োগও আছে। যেমন, জেলখানা নিশ্চয়ই সুন্দর ঘর নয়। তবু তাকে বলা হয় শ্রীঘর। কিংবা ঘরে চাল কম থাকলে তখন 'চাল কম আছে' বলা হয় না, বরং বলা হয় 'চাল বাড়ন্ত'।

উচ্চারণের ভঙ্গি বা বাগ্‌ভঙ্গির কারণেও অর্থ পালটে যেতে পারে। ধরো কেউ বলল, 'হ্যাঁহ্, ভালোই ভদ্র!' এটা দিয়ে তাকে কিন্তু ভদ্র বলা হলো না। বাগ্‌ভঙ্গির কারণে এভাবে বাগ্‌ধারায়ও শব্দের অর্থ পালটে যায়। যেমন, মহাভারতে যুধিষ্ঠির হলো ধর্মপরায়ণ। কিন্তু যখন বাগ্‌ধারায় বলা হয় 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির', তখন সেটি দিয়ে অধার্মিক ব্যক্তিকেই নির্দেশ করা হয়।

শব্দের অর্থ অভিধানে লেখা থাকে। অর্থ বোঝানোর জন্য অভিধানে কখনো কখনো ব্যাখ্যা থাকে, কখনো কখনো সমার্থ শব্দও ব্যবহার করা হয়। তবে অর্থের রূপান্তর বোঝার জন্য তোমাকে আলাদা করে পড়তে হবে। অর্থবিজ্ঞান বলে আলাদা একটা শাস্ত্র আছে। উচ্চতর পর্যায়ে অর্থবিজ্ঞান নিয়েও অনেকে পড়াশোনা করেন। ❑

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



গল্প



শহিদমিনারের জন্য

মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

স্কুলে একটা জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে। মিটিং-এ স্যাররাসহ স্কুল কমিটির সদস্যরাও আছেন। সবাই বসে আছে, এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে জাবির, সাজিদ আর শুভ। ওরা তিনজনই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গণিতের লিমন স্যার অবশ্য সান্ত্বনা ওদের দিয়ে রেখেছে। বলেছে, 'শোন, তোরা টেনশন নিস না। আমি আশাবাদী মিটিং-এ খারাপ কিছু হবে না।'

ওরা তিনজন একটা ভালো কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্যারদের অনুমতি না নিয়ে কোনো ভালো উদ্যোগ নেওয়া তো অপরাধ নয়। দেখা যাক মিটিং-এ কী হয়। মিটিং শুরু হতে দেরি হচ্ছে কারণ সবাই আসলেও মোনায়েম হোসেন ফারুক এখনো আসেননি। তিনি স্কুলের সভাপতি।

জাবিরদের স্কুলের নাম হারাগাছ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়। সবাই অবশ্য হারাগাছ স্কুল বললেই চিনে। ১৯২৩ সালে স্থাপিত। হিসেব করলে একশ বছর। পুরনো এবং অনেক বড়ো একটা স্কুল। উপজেলার বাইরে এত বড়ো স্কুল কোথাও আছে কিনা জানা নাই। স্কুলের মাঠটাও অনেক বড়ো। এই মাঠটাই হারাগাছের কেন্দ্রীয় ঈদগা মাঠ। বড়ো বড়ো খেলার টুর্নামেন্টগুলো এই মাঠেই হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রী প্রায় দেড় হাজারের মতো। পড়াশোনার মানও ভালো। সবকিছুতেই হারাগাছ স্কুলের নামডাক। এত নামডাক, এত বড়ো একটা স্কুল অথচ একটা শহিদমিনার নাই। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে ফুল নিয়ে যায় কলেজের শহিদমিনারে।

ক্লাস এইটের বাচ্চারা মানে সাজিদ, জাবির, শুভ'রা একদিন বসে সিদ্ধান্ত নিলো এই স্কুলে একটা শহিদমিনার নির্মাণ করবে। এখন দরকার টাকার। টাকা কীভাবে আসবে? প্রশ্ন জাগে ওদের মনে। পরে সমাধানও বের করে ফেলে। সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের একসাথে করতে পারলে টাকাটা সহজে সংগ্রহ করা যাবে।

স্কুল কমিটির সভাপতি ফারুক সাহেব চলে এসেছেন। মিটিং শুরু হয়ে গেল। মিটিং-এ অনেকের মতে, জাবিরদের এই কর্ম অপরাধযোগ্য। উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক না কেন অন্যের থেকে টাকা তোলা ভালো কোনো কাজ নয়।

হেডস্যার অবশ্য একটু নরম কণ্ঠে সভাপতির উদ্দেশে বললেন, 'ওরা ছোটো মানুষ। ভুল করেছে। এবারের মতো ওদের মাফ করে দেওয়া যায়।'

সভাপতি ফারুক সাহেব সবার কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি এবার জাবির, সাজিদ আর শুভ'র দিকে তাকিয়ে বললেন,'তোমাদের কিছু বলার আছে?'

এই প্রশ্ন শুনে ওরা তিনজনই নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ কোনো শব্দ করছে না। জাবির ভাবছে শুভ নয়তো সাজিদ কিছু বলবে। কিন্তু ওরা যখন কেউ কিছু বলার আগ্রহ দেখালো না তখন ও হাত উঁচিয়ে ধরল।

ফারুক সাহেব বললেন,'হ্যাঁ, বলো।'

জাবির বলতে শুরু করল। 'কাজটা আমরা ভালোবাসা থেকে করেছি। ১৯৫২ সালে আমাদের ভাইয়েরা সালাম, বরকত, রফিক ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি সকল শহিদদের। তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিনে আমরা ফুল দেই। কোথায় দেই? প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে কলেজের শহিদমিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে আসি। তাই আমরা ভেবেছি, আমাদের স্কুলে একটা শহিদমিনার প্রয়োজন।'

সভাপতি বললেন, 'মিটিং রেজুলেশন কে লিখতেছেন?'

বাদল স্যার বললেন, 'স্যার আমি।'

'মিটিং এর বিষয় কী লিখেছেন?'

'টাকা তোলার অভিযোগ প্রসঙ্গে।' জবাব দিলেন বাদল স্যার।

শুনে ফারুক সাহেব একটু চুপচাপ থাকলেন। এরপর বললেন,' ওই বিষয় কেটে নতুন করে আর একটা বিষয় লেখেন।'

'কী লিখব স্যার?'

'লেখেন শহিদমিনার স্থাপন প্রসঙ্গে। আর সিদ্ধান্ত লেখেন, যত দ্রুত সম্ভব এই স্কুলে একটা শহিদমিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।'

বাদল স্যার বললেন, 'জ্বি স্যার।'

সভাপতি সাহেব এরপর জাবিরদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চারা তোমাদের স্যালুট। দোয়া করি তোমরা অনেক বড়ো হও।'

সভাপতির কথায় সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ❑

শিশুসাহিত্যিক



যে ভাষা খাঁচায় বন্দি

তৌসিফ হাসনাত আনান

আজ শিহাবের এগারো তম জন্মদিন। তাই, আজ জন্মদিনে শিহাব অনেক উপহার পেয়েছে সবার থেকে। সব উপহারই সে পছন্দ করেছে। তবে, তার বাবার ফিরতে আজ দেরি হবে। রাতে বাবা এল। সাথে করে নিয়ে এসেছে শিহাবের জন্য উপহার। শিহাব তার খুশি যেন ধরে রাখতে পারছে না! কারণ তার বাবা তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছে একটি টিয়া পাখি। বাবা তাকে বলল, আজ থেকে এটা তোমার। তুমি একে কথা শেখাতে পারবে! শুনে শিহাব আরও খুশি হলো।

টিয়া পাখিটাকে খাঁচাসহ শিহাব তার রুমে রাখল। সে পাখির খাবার-পানি সব ঠিকঠাক সময়মতো দিত। পাখি যাতে কথা বলা শেখে এজন্য সে রোজ রোজ তাকে নতুন নতুন শব্দ শেখানোর চেষ্টা করত। সে টিয়া পাখিটার একটা নাম দিল, 'মিঠু'। প্রথমে সে ঠিক করল, মিঠুকে নিজের (শিহাবের) নাম উচ্চারণ করা শেখাবে, তারপর মিঠু বলা শেখাবে, এভাবে ধীরে ধীরে পরিবারের সবার নাম বলা শেখাবে।

মিঠু প্রথমে কথা বলতে চাইত না। ছটফট করত। খাঁচায় থাকতে চাইত না। এজন্য শিহাব প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা শেখানোর চেষ্টা চালাতে থাকল। প্রথমে শিহাব বলত, 'হ্যালো, আমার নাম মিঠু।' তবুও মিঠু চুপচাপ থাকত। শিহাবের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে তার মা বলত-

'আরও সময় লাগবে শিহাব। অধৈর্য হইও না।'

কিন্তু শিহাব যেন দেরি সহ্য করতে পারত না। সে ভাবত, বেশি কথা বললেই লোকে মিঠুকে বুদ্ধিমান বলবে। ধীরে ধীরে মিঠু কথা বলতে শুরু করে। অস্পষ্ট উচ্চারণ আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে শুরু করল। শিহাব তো এদিকে আনন্দে আত্মহারা। সে সবাইকে দেখাতো যে তার পোষা পাখি কথা বলে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মিঠুকে শিহাব 'গুড মর্নিং' বলা শেখাচ্ছিল। কিন্তু মিঠু মনোযোগ দিচ্ছিল না। সেটা দেখে শিহাবের দাদু বললেন—

'আচ্ছা শিহাব? তুই কি মিঠুকে কখনো ওর নিজের মতো করে কথা বলতে দিয়েছিস?'

এটা শুনে শিহাব অবাক হয়ে বলল—

কিন্তু দাদু আমি তো জানি, 'টিয়াপাখি কথা নকল করে শুধু। ওদের কি আবার নিজেদের ভাষাও হয়?'

দাদু বললেন, 'কেন হবে না? অবশ্যই আছে।'

সেদিন দুপুরে শিহাব লক্ষ করল, তার ঘরে কয়েকটা চড়ুই পাখি এসেছে। মিঠুর খাঁচার সামনে তারা বসে আছে। মিঠু তাদের সাথে খাঁচার ভেতর থেকে তার নিজের ভাষায় কিছু বলছে!

যা শিহাব বুঝতে পারছে না! মিঠু যা বলছে সেসব শিহাবের কাছে মনে হচ্ছে অদ্ভুত সব শব্দ। কেননা, শিহাব তো তাকে এরকম কিছু কখনো শেখায়নি। ততক্ষণে শিহাব তার দাদুর কাছে গিয়ে বিষয়টা বলল। দাদু বললেন— 'মিঠু তার মাতৃভাষাতে কথা বলছে। তাই তুমি বুঝছ না। তখন বলেছিলাম না? তুমি কি কখনো মিঠুকে তার নিজের ভাষাতে কথা বলতে দিয়েছিলে?'

সেদিন রাতে শিহাব স্বপ্নে দেখল মিঠু ও চড়ুই পাখির কথা বলার দৃশ্য! চড়ুইরা মিঠুকে জিজ্ঞেস করছে, 'তোমাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে কেন?' জবাবে মিঠু বলল, 'আমি কথা বলতে পারি তাই!' এমন স্বপ্ন দেখে শিহাব হকচকিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তারপর স্বপ্ন দেখছিল বুঝতে পেরে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল।

আর দু-দিন পরে ২১শে ফেব্রুয়ারি। এজন্য পরদিন শিহাবের স্কুলের শিক্ষক শিহাবদের ২১শে ফেব্রুয়ারির মাতৃভাষার সংগ্রাম নিয়ে পড়ালেন। এসব শোনার পর শিহাব বেশ বুঝতে পারল মিঠুরও নিজ ভাষাতে কথা বলতে ইচ্ছে করে, আর শিহাব জোরপূর্বক তাকে অন্য কথা শেখাতে চাচ্ছে। সে স্কুলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট জানার পরে নিজের ভুল বুঝতে পারল। তারপর, ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন সকালে, শিহাব মিঠুর খাঁচার দরজা খুলে দিল। যাতে

সে বনে ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচে। নিজের ভাষায় সকল পশুপাখির সাথে কথা বলতে পারে। চারিদিকে তখন প্রভাতফেরির স্লোগান! এমন সময় মিঠু উড়াল দিল। খাঁচা থেকে বেড়িয়ে ডানা ঝাঁপটিয়ে আস্তে আস্তে সে নজরের বাইরে চলে গেল। শিহাব শান্তির এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল! ❑

একাদশ শ্রেণি, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ



কবিতা

ভাষাটা চাই মুখে

গোলাম নবী পান্না

বুক ফুলিয়ে চলার মতো
ভাষাটা চাই মুখে
এমন চাওয়া জাতির যখন
কে আর তখন রুখে।

বায়ান্ন সাল, একুশ তারিখ
লড়াই করে শেষে
ভাষা পেয়ে গর্বে সবাই
বড়াই করে শেষে।

সেই থেকে এই বাংলা ভাষা
প্রাণে জোয়ার আনে
জুড়ে থাকে কথায় এবং
সুরেলা সব গানে।

শহিদমিনার

আকিবা আনাম

শ্রদ্ধার ফুলে ভরে ওঠে
শহিদমিনার চত্বরে
বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে
আমাদের সবার অন্তরে।

বুকের ভেতর আগুন জ্বলে
স্বজন হারানোর বেদনা
একুশ মানে মাথা নত নয়
একুশ বাঙালির চেতনা।

মায়ের মুখের মিষ্টি বাণী
বাংলার-ই গান
এই ভাষাতে হাসি-কান্না
এই ভাষাতে প্রাণ।

নবম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা



ভাষার বিজয়

শরিফা আখতার শিউলি

ভাষার বিজয় এসেছে
রক্তিম পথ ধরে
শহিদেরা দিয়েছে প্রাণ
মায়ের ভাষার তরে।

একুশ মানে বেদনার সুর
গর্বেরও গান
বাংলা ভাষা আমাদের
সকলের-ই প্রাণ।

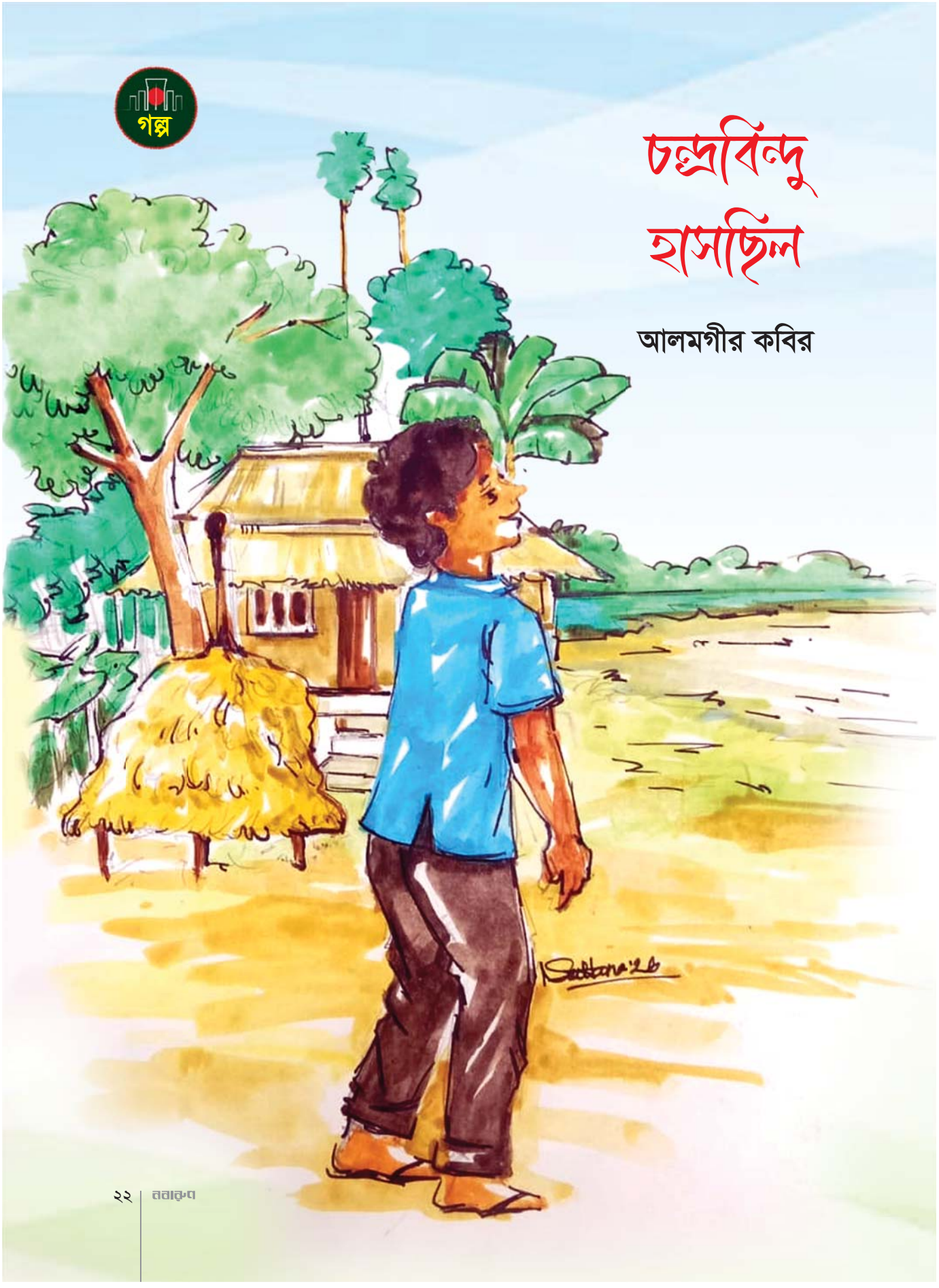
মায়ের ভাষার মর্যাদা
সবাই রাখিব অন্তরে
বাংলা ভাষা অমর হউক
চিরকাল পৃথিবীজুড়ে।

অষ্টম শ্রেণি, বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

গল্প

চন্দ্রবিন্দু হাসছিল

আলমগীর কবির





ছোট্ট তাহসিন। বাবা-মায়ের খুব আদুরে। ক্লাশ ফোরে পড়ে। রোজ রোজ ইশকুলে যায়। কোনো কামাই নেই। একদিন যদি কোনো কারণে সে ইশকুলে যেতে না পারে তাহলে তার খুব মন খারাপ হয়। মুখ ভার করে বসে থাকে। এমনকি তোমারও হয়? তাহসিনের মতো ?

তাহসিন ছড়া পড়তে অনেক ভালোবাসে। তার মজার মজার অনেকগুলো ছড়ার বই আছে। বাবা কিনে দিয়েছেন। মামা কিনে দিয়েছেন।

পড়ার ঘরে বসে তাহসিন ভাবছিল,আচ্ছা, একটা ছড়া আমি লিখতে পারি না?

যেই কথা সেই মতো কাজ।

তারপর তাহসিন খাতা-কলম নিয়ে ভাবতে শুরু করল।

কী নিয়ে ছড়া লিখবে?

মাথায় কিছু আসছিল না।

হঠাৎ সে পড়ার ঘরের জানালা খুলে দিলো।

জানালা খুলে দিতেই সে দেখল আটটি হাঁসের ছানা মা হাঁসের পিছু পিছু ঘুরছে।

তাহসিন ভাবল ছড়া লিখব হাঁসের ছানা নিয়ে। ছড়ার নাম হবে হাঁসের ছানা।

তাহসিন খাতায় লিখল

হাসের ছানা

ছোট্ট হাসের ছানা

খেলবে জলে কাটবে সাতার

নেই তো মায়ের মানা।

হঠাৎ চন্দ্রবিন্দু এসে বলল, তাহসিন তোমার ছড়ায় ভুল আছে!

তাহসিন বলল, তুমি কে?

চন্দ্রবিন্দু বলল, আমি ঁ চন্দ্রবিন্দু।

তাহসিন বলল, ছড়ায় কী ভুল আছে?

চন্দ্রবিন্দু বলল, তুমি হাসের ছানা লিখেছ?

হ আকার এর ওপরে চন্দ্রবিন্দু বসবে।

তুমি লিখছ কাটবে সাতার হবে

কাটবে সাঁতার। স আকার এর ওপরে চন্দ্রবিন্দু।

তাহসিন বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ চন্দ্রবিন্দু।

রাতের বেলা। কী সুন্দর চাঁদনি রাত।

তাহসিন জানালা খুলে দিলো চাঁদ দেখবে বলে।

জানালা খুলে দিতেই তাহসিন দেখল ফুটবলের মতো গোলগাল চাঁদ। অনেক নিচে নেমে এসেছে যেন আজ।

তাহসিন এবার ভাবল চাঁদকে নিয়ে একটা ছড়া লিখব।

তাহসিন চাঁদকে নিয়ে একটা ছড়া লিখল

বলছি তোমায় চাদ মামা
তোমার দেশে ঘুরতে যাবো
অনেক দিনের সাধ মামা।

চন্দ্রবিন্দু আবার এসে হাজির। এবার চন্দ্রবিন্দু মুখ ভার করে রেখেছে।

চন্দ্রবিন্দু বলল, আবার তোমার ছড়ায় একটি ভুল হয়েছে?

কোথায় ভুল তুমি কি বলতে পারবে?

তাহসিন কিছুক্ষণ ভাবল।

তারপর বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। চ আকার এর ওপরে চন্দ্রবিন্দু বসবে।

চন্দ্রবিন্দুর মুখটা তখন ঝলমল করে উঠল।

চাঁদের পাশে চন্দ্রবিন্দু হাসছিল! চাঁদের হাসি দেখে তাহসিনের মুখেও হাসি ফুটে উঠল তখন! ❑

শিশুসাহিত্যিক



রক্তে লেখা ভাষার কথা

মো. ফোয়াদ হাসান

ভাষার মাস এল ফিরে
রক্তিম রঙে ভাসে
একুশ মানে বেদনার গান
হৃদয় মাঝে বাজে।

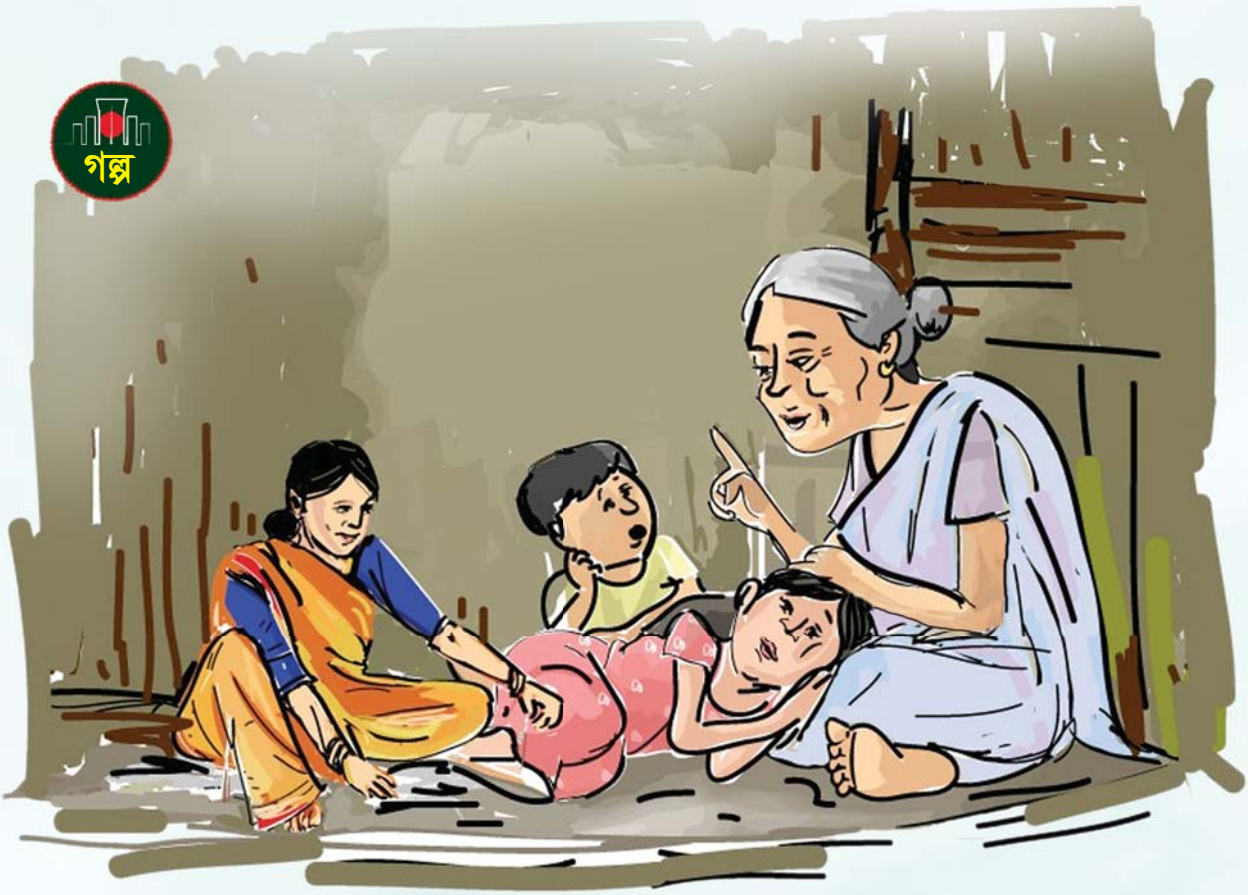
শহিদদের সেই ডাক আজও
কানে বাজে ধ্বনি
মায়ের ভাষা রক্ষায় তারা
দিল জীবন খানি।

ঢাকার পথে রক্ত ঝরে
হয় ইতিহাসে লেখা
মুক্তির সংগ্রাম বাঙালির
একুশ থেকেই শেখা।

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার
নামের মালা গাঁথি,
তাদের ত্যাগেই বাংলা আজ
স্বাধীন দেশের সাথি।

একাদশ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প



ভাষার তৃষ্ণি

আঞ্জুমন আরা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিশা জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক। আট দশ বছরের মেয়ে এত দ্রুত ইংরেজিতে কথা বলে, সবসময় সব কথা বুঝাও যায় না। শিশুকাল থেকে সে ফোনে দাদির সাথে কথা বলে। দাদি শিক্ষিত হলেও দ্রুত কথা বলার কারণে সে সব কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু তিশার আইকিউ ভালো, মা-বাবা যখন বাংলায় কথা বলে, দাদি কথা বলে এখান থেকে তার ভালো বাংলা শেখা হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে মা-বাবার সাথে বাংলাদেশে বেড়াতে এল তিশা। তার সাথে দাদি বাংলায় কথা বলতে বলতে পটু বানিয়ে দিয়েছে তিশাকে। এখন সে দাদির বলা রূপকথার গল্প বুঝতে পারে। তাই বারবার গল্প শোনার জন্য বায়না ধরে। সেদিন বিকেলে ঘরের সদর দরজার সামনে পাকা সিঁড়িতে বসে দাদি গল্প শুরু করলেন

...এক ছিল রাজা।

এমন সময় পাশের বাড়ির রমজান আলির স্ত্রী এলেন। সাথে তার ছয় সাত বছরের বিদেশি নাতি রাফান। তার ছেলে ও নাতি নিয়ে দেশে বেড়াতে এসেছেন। পাকা সিঁড়ির উপর বসে পরলেন তিনিও। দু 'জনেই একে অপরের নাতি-নাতনির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিমিষেই তিশা ও রাফানের মাঝে বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং তারা ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করল। তাদের কথায় মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছেন তিশার দাদি রাহেলা বেগম। তিশা রাফান কে বলল আমার দাদি রূপকথার গল্প জানে তুমি শুনবে? রাফান উত্তর দিল-

ইয়েস ।

দাদি বলতে শুরু করলেন

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল মস্তবড়ো এক প্রাসাদ।

রাজা? প্রাসাদ?

হোয়াট ইজ রাজা? প্রাসাদ?

রাহেলা বেগম বলে উঠলেন

রাজা মানে কিং, প্রাসাদ মানে প্যালেস।

কিছুক্ষণ এভাবে গল্প বলতে বলতে যত বাংলা শব্দের ইংরেজি করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো তাতে গল্প আর গল্প রইল না। গল্পের বারোটা বেজে গেল।

আপনার নাতি একটুও বাংলা বলতে পারে না? রাহেলা বেগম প্রশ্ন করলেন।

কি বলব বুজি! ইচ্ছে তো করে ওর সাথে পরাণ খুইলা কয়ডা কথা কই। কিন্তু কি যে কয় কিচ্ছু বুঝি না। খালি মাথা ঝুলাই আর হয় হয় করি। একটুও বাংলা কইতে পারে না, আর বোঝেও না। আপনার নাতনি কি সুন্দর বাংলা কইতে পারে, বোঝে আবার গল্পও শোনে। দাদির কাছে নাতি নতনির গল্প শোনা হইল আমাদের পরম্পরা। মনটা একটুও ভালো লাগে না।

কথা শেষ করে চোখ মুছলেন তিনি।

রাহেলা বেগম বললেন-

আমরা বাংলায় কথা বলি। বাংলা আমাদের মাতৃ ভাষা। যে ভাষার জন্য শহিদ হলেন জব্বার, বরকত। সেই মায়ের ভাষার মান রাখা আমাদের কর্তব্য। আপনার ছেলের দায়িত্ব ছিল তার সন্তানকে মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলা। তাকে বাংলায় কথা বলতে শেখানো। ইংরেজিতে কথা বলবে সে তো ভালোকথা। তাই বলে কি বাংলা একেবারে বলতে পারবে না। তাহলে সে এদেশের মাটি, মানুষ ও ভাষার প্রতি টান অনুভব করবে কি করে? বাংলা ভাষায় কথা না বললে আমাদের তো তৃপ্তি মেটে না। মনের ভাব অন্তরের মায়া প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষার মতো আর কোনো ভাষা আছে? ওদের তাহলে তৃপ্তি মিটবে কি করে? আপনার ছেলেকে বলবেন ওর সাথে যেন বাংলায় কথা বলে। নইলে আপনার নাতি কোনোদিনও ভাষা শহিদদের সম্মান দিতে শিখবে না। সারাটা জীবন তাহলে ধার করা ভাষায়ই কথা বলতে হবে। মনে রাখতে হবে বাংলাভাষার মতো এমন তৃপ্তি মিটানো ভাষা আর কোথাও নাই। ❑

গল্পকার ও প্রাবন্ধিক



ভাষার গর্ব

মো. সাদেকুল ইসলাম

রক্ত দিয়ে লিখেছে তারা
স্বাধীনতার গান,
বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব,
আমাদেরই প্রাণ।

একুশ মানে প্রতিবাদ,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে,
একুশ মানে
মাথা তুলে দাঁড়ানো দৃঢ়ভাবে।

বিশ্বজুড়ে আজকে ধ্বনি-
বাংলা আমার ভাষা,
এই ভাষাতে ভালোবাসা,
এই ভাষাতে সকল আশা।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
আজ বাংলারই জয়,
মায়ের ভাষার মর্যাদা যেন
চিরদিন অক্ষত রয়।

গল্প

আমার ভাষা আমার মা

জুয়েল আশরাফ

শহিদমিনারের সামনে আজ অদ্ভুত ভিড়। ভিড়টা অদ্ভুত এই কারণে না যে মানুষ বেশি, বরং মানুষগুলো কেমন যেন অদ্ভুত। সবাই খুব সিরিয়াস মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তাদের চোখে একটা চাপা উত্তেজনা। ঠিক পরীক্ষার আগে যেমন থাকে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি আব্বার পাশে। আব্বা খুব গম্ভীর মানুষ। একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই আরও গম্ভীর হয়ে যান। আজ সকাল থেকে তিনি তিনবার বলেছেন, 'ভাষার জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে, এটা ভুলে যাস না।'

আমি মাথা নেড়েছি।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভাবছি, মানুষ ভাষার জন্য মরল কেন? ভাষা তো কথা বলার জিনিস। কথা বললেই যদি



মরতে হয়, তাহলে তো আমাদের স্কুলের হেডস্যার প্রতিদিন দু'বার করে মারা যাওয়ার কথা।

আমার নাম রিদওয়ান। আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। পড়ালেখার চেয়ে মানুষের আজব আচরণ দেখতে আমার বেশি ভালো লাগে। এই কারণে আমি আবিষ্কার করেছি, আমাদের বাংলা স্যার আসলে ভেতরে ভেতরে একজন কবি।

শহিদমিনারের পাশে হঠাৎ দেখি, আমাদের স্কুলের দপ্তরি কাদের চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে একটা নীল কাগজ আর লাল রঙের চক। আমি ফিসফিস করে বলি, 'চাচা, চক কেন?'

কাদের চাচা চোখ কুঁচকে তাকান। খুব রহস্যময়ভাবে বলেন, 'আজ রাতে কাজে লাগবে।'

এই কথার পর আমার মাথার ভেতরে বাজ পড়ে যায়। রাতে? শহিদমিনারে? লাল চক? আমি বুঝতে পারলাম, আজ কিছু একটা ঘটবে।

স্কুলে পৌঁছেই দেখি প্রধান শিক্ষক মাইকে ঘোষণা দিচ্ছেন, 'আগামীকাল সবাই নিজের মাতৃভাষা নিয়ে একটা লেখা আনবে। কপি করলে শাস্তি।'

ক্লাসে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। সুমন বলে, 'গুগল থেকেও কপি করা যাবে না?'

শাওন বলে, 'আমার তো গুগলই মাতৃভাষা!'

সবাই হাসে। বাংলা স্যার হাসেন না। তিনি চশমা খুলে বলেন, 'যে ভাষায় তোমার মা তোমাকে ডাকেন, সেটাই মাতৃভাষা।'

এই কথাটা আমার কানে আটকে যায়। মা আমাকে ডাকে, 'এই যে রিদওয়ান, মোবাইল রাখ!' এই ভাষার জন্য কেউ জীবন দেয়?

রাতে আমি লুকিয়ে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বের হই। এটা অন্যায় কাজ, তবুও আমি করি। কারণ আমার মা খুব দ্রুত ঘুম থেকে উঠতে পারেন। আমি সোজা শহিদমিনারে যাই। দেখি কাদের চাচা, আমাদের বাংলা স্যার, আর আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের হাতে লাল চক।

বাংলা স্যার মাটিতে লিখছেন, 'আমার ভাষা-আমার মা।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'স্যার, এটা তো মুছে যাবে।'

স্যার হালকা হাসেন।

'ভাষাও তো তাই। যত্ন না নিলে মুছে যায়।'

কাদের চাচা তখন বলেন, '৫২-তে যারা রাস্তায় নেমেছিল, তারাও জানত-মুছে যেতে পারে। তবু লিখেছিল।'

আমি কিছু বলি না। বুকের ভেতরে কেমন একটা লাগে। হঠাৎ কাদের চাচা নীল কাগজটা খুলে দেন। কাগজে লেখা অনেক নাম। ছোটো ছোটো হাতের লেখায়। আমি চমকে যাই।

'এগুলো কার নাম?'

চাচা বলেন, 'আমাদের এলাকার মানুষ। যারা ঠিক ভাষার জন্য মারা যায়নি, কিন্তু ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কেউ শিক্ষক, কেউ মা, কেউ গল্পকথক।'

বাংলা স্যার বলেন, 'শহিদ মানে শুধু রক্ত নয়। শহিদ মানে দায়িত্ব।'

এই কথাটা আমার মাথার ভেতরে ঢুকে বসে যায়।

পরদিন একুশের প্রভাতফেরি। আমি ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছি। ফুলগুলো আগের চেয়ে ভারী মনে হচ্ছে। স্কুলে আমি লেখা জমা দিই। লেখার নাম, 'আমার মায়ের ডাকা ভাষা।'

বাংলা স্যার পড়ে চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'এই লেখাটা দেয়ালে লাগানো হবে।'

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনে হয়, আমি ছোট্ট একটা কাজ করেছি।

রাতে মা আমাকে ডাকে, 'এই যে রিদওয়ান, ভাত ঠান্ডা হচ্ছে।'

আমি দৌড়ে যাই। মায়ের এই ডাকে আজ অন্যরকম লাগে। আমি বুঝতে পারি, ভাষা আসলে বইয়ের ভেতর না। ভাষা থাকে ডাকের মধ্যে, গল্পের মধ্যে,

হাসির মধ্যে। আর একুশে ফেব্রুয়ারি মানে শুধু ফুল দেওয়া না। একুশে মানে, নিজের ভাষাকে প্রতিদিন একটু যত্নে রাখা।

আমি মনে মনে বলি, 'ঠিক আছে। রাখব।'

একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটা শেষ হয়ে আসে খুব ধীরে। এমন দিনগুলো সাধারণত তাড়াতাড়ি শেষ হয় না। সময় যেন একটু থমকে দাঁড়ায়, ভাবতে থাকে আরও কিছু বাকি আছে কি না।

আমি বিকেলে স্কুলে যাই। স্কুল আজ খোলা, কিন্তু ক্লাস নেই। শুধু দেয়াল জুড়ে লেখা আর ছবি। কেউ শহিদমিনার এঁকেছে, কেউ কবিতা লিখেছে, কেউ শুধু বড়ো বড়ো করে লিখেছে, 'আমার ভাষা বাংলা।'

আমি নিজের লেখাটা খুঁজে পাই। দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায়, একটু উঁচুতে লাগানো। নিচে লেখা, রিদওয়ান, ষষ্ঠ শ্রেণি। এই প্রথম আমার নামটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

হঠাৎ দেখি, বাংলা স্যার আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। চশমা খুলে হাতে ধরে আছেন। চোখে অদ্ভুত একটা আলো। তিনি বলেন, 'রিদওয়ান, জানিস, ভাষা বাঁচে কীভাবে?'

আমি মাথা নাড়ি।

স্যার বলেন, 'ভাষা বাঁচে গল্পে। মানুষ গল্প বলা বন্ধ করলে ভাষা মরে যায়।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপর বলি, 'তাহলে আমি কি গল্প বলব?'

স্যার হালকা হেসে বলেন, 'তুই তো বলছিসই।'

রাতে আমি ছাদে উঠে বসি। ঢাকার আকাশে তারা দেখা যায় না খুব একটা। তবু আজ একটা তারা দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়। হয়ত আমি নিজেই বানিয়ে নিচ্ছি।

হঠাৎ দেখি, কাদের চাচা নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই বলেন, 'এই যে, ভাষার সৈনিক!'

আমি লজ্জা পাই।

'চাচা, আমি তো কিছুই করিনি।'

কাদের চাচা মাথা নাড়েন।

'এই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো কাজ।'

তারপর তিনি পকেট থেকে লাল চকটা বের করেন। ভাঙা, ছোটো হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, 'এটা রাখ। শেষ চকটা।'

আমি চকটা হাতে নেই। অদ্ভুতভাবে হাত কেঁপে ওঠে।

পরদিন স্কুলে আমি একটা কাজ করি। কেউ জানে না। ক্লাস শেষে বেঞ্চের নিচে, খুব ছোটো করে আমি লাল চক দিয়ে লিখে দিই, 'আমার ভাষা-আমার মা।'

লেখাটা খুব ছোটো। কেউ খেয়াল নাও করতে পারে। কিন্তু আমি জানি, এটা আছে। আমি মনে মনে ভাবি, সব শহিদমিনার কি বড়ো হতে হয়?

রাতে মা আমাকে ঘুম পাড়াতে এসে বলে, 'আজ সারাদিন কী করলি?'

আমি বলি, 'ভাষা নিয়ে ভাবছিলাম।'

মা হাসেন।

'এত ভাবিস কেন?'

আমি উত্তর দিই না। কারণ কিছু উত্তর শব্দে বলা যায় না। আমি চোখ বন্ধ করি। মায়ের কণ্ঠটা ভেসে আসে। নরম, পরিচিত, নিরাপদ। আমি বুঝে যাই, একুশে ফেব্রুয়ারি কোনো নির্দিষ্ট দিনের নাম না। এটা একটা দায়িত্ব, যেটা মানুষ প্রতিদিন একটু একটু করে বহন করে। আর আমি, রিদওয়ান, আজ থেকে সেই দায়িত্বটা খুব ছোটো করে, খুব যত্নে বহন করব। ঠিক লাল চকটার মতো। শেষ হয়ে গেলেও চিহ্ন রেখে যায়। ❑

কথাসাহিত্যিক



ফেব্রুয়ারির ফুল

ইভা জান্নাত শহিদা

আরিশ এবং রাফি আজ ভোরের আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। ফুলের তোড়া বানানোর জন্য ফুল আনতে বাগানে গেল তারা। বাগানে গিয়ে রাফি ফুল তুলতে উদ্যত হলে আরিশ বাধা দিলো।

আরিশ বলল, আর একটু অপেক্ষা করি, গাছেরা এখনো ঘুম থেকে উঠেনি। এখন তাদের ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না।

রাফি অবাক হয়ে আরিশের দিকে তাকালো, মুখ ভেঙিয়ে বলল, 'গাছেরা আবার ঘুমোয় নাকি?'

আরিশ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল, হ্যাঁ, বাগানের গাছেরাও রাতে ঘুমোয়। ওরা সকালে সূর্যের আলোয় সবুজের সতেজ হাসি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে। মন দিয়ে দেখো, পাতারা কেমন নেতিয়ে পরেছে। সারাদিন ওরা দাঁড়িয়ে থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য বাড়িয়ে



তোলে, খাদ্য তৈরি করে নিজেদের জন্য। তারাও ক্লান্ত হয়, তাদেরও বিশ্রামের দরকার।

রাফি ভাবনায় পড়ে গেল। আরিশের হাত ধরে টেনে নিয়ে বলল, তাহলে চলো, আরো কিছুক্ষণ পরে আসব।

ফিরে আসবে বলে পা বাড়াতেই যেন শুনতে পেল, ফুলেরা তাদের ডাকছে।

গোলাপ বলছে, 'আমাকে নিয়ে যাও।'

গাঁদা বলছে, 'আমাকে নিয়ে যাও।'

চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা সবাই বলছে, 'আমাকে নিয়ে যাও।'

আরিশ এবং রাফি এবার ভাবনায় পড়ে গেল, 'কাকে রেখে কাকে নেব, এরা সবাই আজ আমাদের কাছে আসতে চাইছে!'

তখন আরিশের একদিনের কথা মনে পরে গেল, তার বন্ধু এসে ফুল ছিঁড়তে চাইছিল। সেদিন সব ফুলেরা হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। অনুরোধের সুরে বারবার বলছিল, আমাদের ছিঁড়ো না প্লিজ, আমাদের গাছ থেকে আলাদা করো না। কিন্তু আজ এরা এত আগ্রহী কেন?

ফুলেদের জিজ্ঞেস করল আরিশ, 'আচ্ছা বলো তো, আজ তোমরা নিজে থেকে আমাদের কাছে আসতে চাইছো কেন? সেদিন তো কান্না করছিলে? আজ কী হলো তোমাদের?'

তখন ফুলের রাজা গোলাপ বলতে শুরু করল, 'কারণ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা শহিদমিনারে যেতে চাই। এটা আমাদের জন্য অনেক সৌভাগ্যের। শহিদদের আত্মত্যাগের কথা আমরা জানি। আমরা কখনোই তাদের ভুলব না। আজ আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই ফুটেছি। আর সেদিন তোমার বন্ধু অকারণেই আমাদের গাছ থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাতে রেখে শুকিয়ে গেলে আবর্জনার মাঝে ফেলে দিত। আমরা পবিত্রতা ভালোবাসি। আবর্জনার মাঝে ফেললে আমাদের খুব কষ্ট হয়।'

শহিদদের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি দেখে আরিশ ও রাফি দুজনেই মুগ্ধ হলো। বাগানের সেরা ফুলগুলো তুলে নিল তারা। খুব যত্ন ও সম্মানের সাথে ফুলের তোড়া বানালো দুজনে। তারপর খালি পায়ে হেঁটে ফুলের তোড়া নিয়ে শহিদমিনারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো তারা।

ভোরের আলোয়, নীরবতা ও শ্রদ্ধায় ভরে আছে পথঘাট। সকলের পরিচিত সেই 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গানটি গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে এগোচ্ছিল আরিশ ও রাফি, বুকের ভিতরে জমে থাকা অনুভূতিরা গানে গানেই বেরিয়ে আসছিল। ❑

গল্পকার

গল্প

একুশ আমার গর্ব

শারমিন নাহার ঝর্ণা

রোমানা ক্লাস ফাইভে পড়ে। খুব মিষ্টি একটা মেয়ে। নতুন নতুন কিছু জানতে তার ভীষণ ভালো লাগে। একদিন স্কুলে বাংলা ক্লাসে ম্যাডাম বোর্ডে বড়ো করে লেখলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে তোমরা কী জানো? সবাই জোরে বলে উঠল এই দিনটিতে সবাই খালি পায়ে হেঁটে শহিদমিনারে যায়, ফুল দেয়, আর খুব সকালে গান শোনা যায়- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।

তারপর ম্যাডাম বললেন তোমরা কি শুধু এটুকুই জানো? চলো আজ তোমাদেরকে একটা গল্প বলি। অনেক বছর আগে, যখন বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ ছিল না,তখন আমাদের দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। সে সময় অনেকেই চাইত আমরা বাংলায় কথা বলব না। তারা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাই তো ছিল আমাদের মায়ের ভাষা, আমাদের হৃদয়ের ভাষা। তখন অনেক ছাত্র-যুবক প্রতিবাদ করেছিল। তারা বলেছিল,আমরা বাংলায় কথা বলব,বাংলাই আমাদের ভাষা। তাদের সেই সাহসী আন্দোলনের দিন ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সহ নাম না জানা অনেক দামাল ছেলের রক্তের





বিনিময়ে ফিরে পেয়েছি আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা। তাদের এই মহান ত্যাগের বিনিময়ে আজ তোমাদের সাথে প্রাণ খুলে বাংলায় কথা বলতে পারছি বলে ম্যাডামের চোখে একটু জল চলে আসলো। সেদিন অনেক মানুষ বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল, শুধু যাতে আমরা আজ মুক্তভাবে বাংলায় কথা বলতে পারি সেজন্য। রোমানা চুপচাপ শুনছিল। তার মনের ভেতর বাংলা ভাষার জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পরের দিন রোমানা স্কুলে গেল নতুন উদ্দীপনায়। সে খুব সুন্দর করে বাংলা হাতের লেখা লেখল। কবিতা আবৃত্তি করল। বন্ধুকে বলল, আমাদের ভাষা কত সুন্দর, তাই না? হুম আমাদের ভাষা আমাদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আজকে চলো আমরা সুন্দর করে বাংলা ভাষায় সবাই মিলে একসাথে কবিতা আবৃত্তি করি। সবাই খুব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করল। ওদের কবিতা আবৃত্তি এত সুন্দর হয়েছে যে অন্য ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকরা সবাই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শুনে জোরে হাতহালি দিল। সবাই জোরে বলে উঠল বাংলা ভাষা আমাদের মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা। কয়েকদিন পরেই ২১শে ফেব্রুয়ারি। ২১শে ফেব্রুয়ারির সকালে রোমানা মা-বাবার সঙ্গে শহিদমিনারে গেল। সে হাতে ফুল নিয়ে খুব যত্ন করে রাখল। মনে মনে বলল, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, বাংলা ভাষাকে সম্মান করি। তোমরা যারা এই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছ তোমাদের সকলের প্রতি জানাই অজস্র সম্মান ও ভালোবাসা। তারপর রোমানা বাড়ি ফিরে তার খাতায় বড়ো করে এবং খুব সুন্দর করে লেখল, একুশ আমার গর্ব। তারপর সেটা তার পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখল। ❑

শিশুসাহিত্যিক



একুশের কাছে ঋণী

নাহার আহমেদ

একুশ করেছে অহংকারী
বাংলায় কথা বলতে পারি
আমরা ঋণী বাঙালি জাতি
একুশের কাছে তাই।

বুকের রক্ত সেদিন দিয়েছি
আন্দোলনের ফসল পেয়েছি
সুখ-দুঃখের নিত্য ছবি
বর্ণমালায় সাজাই।

অনুভূতির আকাশ জুড়ে
বেহিসেবি ছন্দে সুরে
কথার মধু দেই ছড়িয়ে
ইচ্ছে পাখির ডানায়

স্বপ্নগুলো বেড়ায় ভেসে
কাছে এসে দিনের শেষে
কত যে সুখ বিলায় ওরা
আমার মাতৃভাষায়।

ফেব্রুয়ারি

অরিজিৎ পোদ্দার আর্দ্র

ফেব্রুয়ারি মনে করায়
মায়ের মলিন মুখ,
ফেব্রুয়ারি মনে করায়
রক্তে ভেজা বুক।

ফেব্রুয়ারি মনে করায়
মায়ের খালি কোল,
ফেব্রুয়ারি মনে করায়
প্রথম শেখা বোল।

ফেব্রুয়ারি মনে করায়
গুলির সামনে স্লোগান,
ফেব্রুয়ারি মনে করায়
মাতৃভাষার জয়গান।

দশম শ্রেণি, ব্রাহ্মন্দী কামিনী উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী

একুশের অঙ্গীকার

মো. মাহমুদুল হাসান

একুশের ভোরে শহিদমিনার
ভরে ওঠে ফুলে ফুলে
শহিদদের প্রতি ভালোবাসা
আর শ্রদ্ধা জাগে মনে।

মায়ের ভাষার অধিকার
কেউ নিতে পারবে না
এই বিশ্বাস যে ছিল বুকে
পাকিদের ছিল তা অজানা।

শহিদেরা দেখিয়েছে
কেমন করে বাঁচতে হয়
ভাষার জন্য জীবন দিতে
করেনি তারা কোনো ভয়।

একাদশ শ্রেণি, পুলিশ লাইনস স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

রক্তে কেনা ভাষা

বদরুল হক

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
রক্ত দিয়ে কেনা,
বাংলায় লিখি বাংলায় বলি
বাংলায় লেনা-দেনা।

শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল
কেড়ে নিতে ভাষা,
খেলল তারা মরণ খেলা
ভীষণ সর্বনাশা।

সালাম রফিক বরকতেরই
গুলিতে প্রাণ নাশে,
বুকের রক্তে নদীনালা
পিচঢালা পথ ভাসে।

জীবন দিয়ে মাতৃভাষা
রক্ষা করে তারা,
বাংলা বর্ণে মিশে আছে
মায়ের অশ্রুধারা।

এই পাখিরা

খায়রুল আলম রাজু

হলদে-সবুজ রংবেরঙের
একটা দু'টো পাখি,
বুকের খাঁচায় খুব আদরে
আগলে তাদের রাখি।

এই পাখিরা কথার পাখি
খুব যে ভীষণ দামি;
রক্ত দিয়ে বায়ান্নতে
কিনেছিলাম আমি।

দেশের মানুষ এই পাখিদের
বড্ড ভালোবাসে,
তাই পাখিরা গান-কবিতা
বইয়ের পাতায় হাসে-

এই পাখিরা ভাষার পাখি
বর্ণমালার সাথি!
এই পাখিরা জীবন আমার
আঁকড়ে আছে জাতি।

একুশের আলো

মো. ফারুক আহমেদ

একুশ মানে আলোর পথ
জেগে ওঠা প্রাণ
ভাষার জন্য জীবন দেওয়া
অমর সেই গান।

শহিদেরা দেখিয়েছে
সাহস কাকে বলে
মায়ের ভাষার জন্য
জীবন দিয়েছে চিরতরে।

শহিদমিনারে ফুল দিয়ে
করি তাঁদের স্মরণ
একুশ এলেই আমরা করি
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বরণ।



আমার লাইব্রেরি আমার বন্ধু

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, তোমার প্রিয় বন্ধু কে? আমি বলব, লাইব্রেরি। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মানুষের বন্ধু তো মানুষই হবে, লাইব্রেরি বন্ধু হয় কী করে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলব, আগে জানো বন্ধু কী এবং কাকে বলে? বন্ধু অর্থ মিত্র, সখা, সুহৃদ হিতৈষী ব্যক্তি, স্বজন বা প্রিয়জন। যে সুখে-দুঃখে কাছে থেকে বিপদে আপদে সাহায্য করে সেই ই হচ্ছে বন্ধু। মনের কষ্টের কথা যাকে বলে মনকে অনেকটা হালকা করে কষ্ট দূর করা যায় সেই তো প্রকৃত বন্ধু। ঠিক তেমনি বই পড়েও কিন্তু এসব সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়। তাহলে কী বইকে বন্ধু হিসেবে ভাবা যায় না? আর লাইব্রেরি হচ্ছে বইয়ের স্থান। লাইব্রেরির বাংলা অর্থ হচ্ছে গ্রন্থাগার, মানে গ্রন্থ+আগার। গ্রন্থ মানে বই আর আগার মানে ঘর বা স্থান। লাইব্রেরির পুরো অর্থ হলো বইয়ের ঘর। তাই এই বইয়ের ঘর বা স্থানকেই আমি বন্ধু হিসেবে বিবেচিত করেছি।

লাইব্রেরিকে বন্ধু বলা মানে বইকেই বন্ধু বলা। বই পড়ে আমরা জ্ঞানার্জন করতে পারি। বন্ধুর কাছ থেকে যেমন দুঃসময়ে সহযোগিতা পাওয়া যায়, চিন্তা ভাবনা মাথায় থাকলে বন্ধুর সহযোগিতা যেমন তা লাঘব করা সহজ হয়। ঠিক তেমনি বই পড়েও আমরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পেতে পারি। বই পড়ে যে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি সে ধরনের সমস্যার সমাধান সহজে পেতে পারি। সে হিসেবে বইকে তো বন্ধুই বলা যায়।

একটি লাইব্রেরিতে নানা ধরনের বই থাকে। যার যেটা প্রয়োজন সেটাই পড়তে পারে। যেমন- ইতিহাসভিত্তিক বই পড়ে আমরা নিজ দেশের ইতিহাসটা জানতে পারি। এদেশ এক সময় ইংরেজদের দখলে চলে গিয়েছিল মীর জাফরদের মতো মানুষের কারণে। তারপর দুইশত বছর পর সেই গোলামী থেকে বাঙালিরা মুক্ত হয়। কিন্তু আবার পাকিস্তানের খপ্পরে পড়তে হয়। চব্বিশ বছর তাদের সাথে লড়াই করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হয়। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা এই ইতিহাসটা জানতে পারি। যার কাছ থেকে দেশের ইতিহাস জানতে পারি, সে কি বন্ধু নয়?

আবার বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়ে আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক ঘটনা জানতে পারি, যেমন- পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কীভাবে ধ্বংস হবে তা জানতে পারি। পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমেরিকার গ্রীন হাউজ এফেক্টের কারণে। বায়ুমণ্ডল বেশি গরম হলে পৃথিবী দ্রুত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের তথ্য আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক বই পড়ে জানতে পারি। কোন বিজ্ঞানী কি আবিষ্কার

করছে। সেই আবিষ্কার মানবকূলের জন্য কতটা আশির্বাদস্বরূপ তাও জানতে পারি বিজ্ঞান বই পড়ে। তাহলে কি বই তথা লাইব্রেরি বন্ধু হতে পারে না?

আমাদের দেশের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। কি সে ঐতিহ্য? দেশীয় ঐতিহ্যভিত্তিক বই লাইব্রেরিতে আছে। তা পড়লেই আমরা জানতে পারি গ্রাম বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের কথা। বাংলা সালের প্রবর্তক মোঘল সম্রাট আকবর, পহেলা বৈশাখে আমরা পান্তা ইলিশ খাই কেন,এদেশের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় কখন, বিভিন্ন পূজা উপলক্ষ্যে নানা ধরনের মেলার আয়োজন হয়। এসবই বই পড়ে জানা যায়।

ধর্মীয় ব্যাপারেও কিন্তু একই কথা চলে আসে। আমরা কীভাবে নামাজ আদায় করব, কীভাবে রোজা রাখব, কোন কাজটি করলে আল্লাহ পাক খুশি হন, কোন পথে চললে আল্লাহ পাক বান্দার ওপর নাখোশ হন তা ধর্মীয় বই পড়ে জানতে পারি। ঠিকমতো এবাদত বন্দেগী করার নিয়ম এবং অসৎ পথ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কীভাবে চলতে হবে এসবও ধর্মীয় বই পড়েই জানা যায়। তাহলে তো এই বইগুলোকে আমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। আর বই এর সঙ্গে লাইব্রেরির নামটিও চলে আসে। লাইব্রেরিতে বসেই এসব বই পড়া যায়।

সংস্কৃতি বিষয়ক বই পড়েও আমরা অভিনয় শিখতে পারি, কীভাবে নাটক লিখতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারি। বই পড়ার মাধ্যমে নাটক লেখার কলা-কৌশল,অভিনয় শেখার কলা-কৌশল জানতে পারি। এটাও তো বন্ধুত্বেরই কাজ হতে পারে। কৃষি বিষয়ক বই পড়ে আমরা কীভাবে বেশি ফসল ফলানো যায়, কোন পোকা ফসলের জন্য বেশি ক্ষতিকর এবং তার জন্য কী করা উচিত, কোন ফসল কোন ধরনের মাটিতে বেশি হয় এসব কৃষিভিত্তিক বই এর মাধ্যমে জানা যায়। তাহলে এটা কি বন্ধুর পরিচয় নয়?

ক্রীড়া বিষয়ক বই পড়ে কীভাবে খেললে সে খেলাতে জয় লাভ করা যায়, মাঠে কীভাবে অনুশীলন করে খেলায় নামতে হয়, কোন খেলা কীভাবে খেললে ভালো হয় তা জানা যায়। এই ধরনের ক্রীড়া বিষয়ক বই পড়ে অনেক খেলোয়াড় জীবনে উন্নতি করেছে। সে হিসেবে এই ক্রীড়া বিষয়ক বইও তো বন্ধুই বটে।

অবশেষে বলব, যে-কোনো বিষয়ভিত্তিক বই পড়েই সে বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি, সর্ববিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারি। তাই সর্বপ্রকার বই-ই হচ্ছে আমাদের বন্ধু আর বইয়ের ঘর লাইব্রেরি যেখানে বসে বই পড়া হয় সেটাও আমাদের বন্ধু।

বই তথা লাইব্রেরিকে বন্ধু বলার আরো কিছু যুক্তি তুলে ধরছি। মানুষের সুখের মাঝে যখন কোনো অশান্তি এসে বিরাজ করে তখন সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। প্রকৃত বন্ধু তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারে। ঠিক তেমনি যখন মন অশান্তিতে থাকে, মনের মাঝে আবোল তাবোল ভাবনা এসে যায়। ঠিক তখন বইটি নিয়ে যদি বসা যায়, পড়ার দিকে মন দেয়া যায়, দেখবে পড়ার দিকে মন দেয়াতে যে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা ছিল, তা দূর হয়ে গেছে। তাহলে কি বলতে পারি বই বন্ধুই এ কাজটি করেছে?

সুতরাং শত মনখারাপের মাঝে যখন বইটি হাতে তুলে নিবো এবং পড়ার মাঝে মন দিবো তখন বই পড়তে পড়তে মন ভালো হয়ে যায়।

নিজকে যখন একা একা মনে হবে, কথা বলার সঙ্গী পাওয়া যাচ্ছে না তখন বইয়ের প্রতি মনোযোগী হলে দেখবে বইটিই তখন প্রিয় সঙ্গী তথা বন্ধু হয়ে যাবে। এভাবে বই আমাদের বন্ধুর মতো পাশে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নেপোলিয়ন কত বড়ো মাপের একজন বীর ছিলেন তা আমাদের সবারই জানা আছে। এই বীর বিপদ এলে বই পড়তেন। এটা তার মনের স্বস্তির ঔষধ হিসেবে কাজ করত। তিনি যখন যুদ্ধে যেতেন সঙ্গে তখন বই নিয়ে যেতেন অবসর সময়ে পড়ার জন্য। ভাবা যায়, এত বড়ো একজন বীর, তিনিও বইকে বন্ধু হিসেবেই দেখতেন।

দ্বিতীয় মোঘল সম্রাট হুমায়ুন- এর চির শত্রু ছিল ফরিদ খান। কারণ তার জন্য রাজ্য ছাড়তে হয়েছে।



সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, রাজ্য ছেড়ে পালানোর সময় সম্রাট হুমায়ুন তার বইয়ের বোঝাটিও প্রহরীদের দিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। মানে তিনিও বইকে বন্ধু হিসেবে ভেবেছেন। এই বই-ই তাঁকে সাহস জুগিয়েছে মনকে চাঙা রাখতে।

বিশ্বজুড়ে নিত্য নতুন অনেক উৎসব হয়। কিন্তু আমি বলব, সবচেয়ে সেরা উৎসব হলো ফেব্রুয়ারির বইমেলার উৎসব। একে আমি বলব মহোৎসব । বইয়ের মেলায় জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায়। বই পড়ে মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায়। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ এসব নিছক ফানুস বইয়ের কাছে। তাই সবশেষে বলতে চাই, প্রিয় বন্ধু হিসেবে বই তথা লাইব্রেরিকে কেন বেছে নিলাম তার অনেক যুক্তি উল্লেখ করেছি। আমার বিশ্বাস তোমরাও আমার সাথে একমত হয়ে বলবে, আমার লাইব্রেরি আমার বন্ধু। ❑

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না। - সৈয়দ মুজতবা আলী

বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া হয় না, কোনোদিন মনোমালিন্য হয় না। - প্রতিভা বসু

জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- বই, বই এবং বই। - টলস্টয়

আমরা যখন বই সংগ্রহ করি, তখন আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি। - ভিনসেন্ট স্টারেট

ভালো বই পড়া যেনো গত শতকের মহৎ লোকের সাথে আলাপ করার মতো। - দেকার্তে

বই পড়ার অভ্যাস নেই আর পড়তে জানে না এমন লোকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। - মার্ক টোয়েইন

গল্প

রক্তে কেনা মাতৃভাষা

ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

ফেব্রুয়ারির এক বিকেলে হালকা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পুরনো দোতলা বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন ৭৮ বছরের আবদুল করিম সাহেব। সবাই তাকে 'দাদা' বলে ডাকে। মাথায় সাদা চুল, মুখে পাতলা দাড়ি। তার হাতে একটা পুরনো বই 'একুশের স্মৃতি'। স্কুলের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ছুটে এলেন ১০ বছরের নাতি সাফওয়ান। নীল শার্ট, সাদা প্যান্ট। চোখে-মুখে কৌতূহলের ঝিলিক।

আসসালামু আলাইকুম দাদা! জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বলল সাফওয়ান। ওয়ালাইকুমুস সালাম, বাবা। এসো এসো। দাদা বই থেকে চোখ তুলে হাসলেন।



সাফওয়ান ব্যাগটা একপাশে ফেলে দাদার পাশে বসল। দাদা, আজ স্কুলে একটা মজার ক্লাস হলো। কী হলো? দাদা চশমাটা ঠিক করে নিলেন।

বাংলা ক্লাসে স্যার বললেন, তোমরা জানো, আমরা কতটা ভাগ্যবান যে আমরা নিজের ভাষায় পড়াশোনা করতে পারছি। পৃথিবীর অনেক জাতি আছে যারা এখনও পরাধীন, নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে না। তখন আমি হাত তুলে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, আমরা তো আগে থেকেই বাংলায় কথা বলি। তাহলে কীভাবে আমরা ভাগ্যবান হলাম? দাদার চোখে-মুখে গভীর ছায়া নামল। তিনি গভীর নিশ্বাস ফেলে জানতে চাইলেন। স্যার কী



বললেন? স্যার বললেন, তোমার দাদা-নানারা ভালো জানেন। আগামীকাল তাদের কাছে শুনে আসবে। তারপর স্যার আলোচনা করবেন বলেছেন। তাই এসেছি, দাদা। বলো না, আমাদের এই মুখের ভাষা, বাংলা ভাষা, রাষ্ট্রভাষা হয়ে উঠল কীভাবে? এর কি কোনো ইতিহাস আছে? দাদা বইটা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ বন্ধ করলেন। যেন ৭০ বছর পেরিয়ে ফিরে যাচ্ছেন সেই দিনগুলোতে।

ইতিহাস আছে মানে! দাদার গলা কাঁপল। ইতিহাস না বলে বলো, এক রক্তাক্ত আত্মত্যাগের মহাকাব্য। বাঙালিরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। গুলি খেয়ে মরেছে। সাফওয়ান চমকে উঠল। কী হয়েছিল দাদা? শুরু থেকে বলো না। সাফওয়ান মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল। দাদা জানালার দিকে তাকালেন। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ঠিক এমনই এক বিকেলে, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলো, দাদা শুরু করলেন— ইংরেজরা চলে গেল। কিন্তু রেখে গেল দুটো টুকরো, ভারত আর পাকিস্তান। আমরা পড়লাম পূর্ব পাকিস্তানে। আর যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল, তারা হাজার মাইল দূরে। মাঝখানে গোটা ভারত। তারপর? তারপর শুরু হলো অত্যাচার। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা ঘোষণা করল উর্দু শুধুমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্তানে ৫ কোটি ৬০ লাখ মানুষ, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৩ কোটি ৩০ লাখ। মানে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলায় কথা বলে। তবুও তারা বলল, উর্দু ভাষাতেই আমাদের কথা বলতে হবে!

সাফওয়ান রাগে মুঠি শক্ত করল। এটা তো অন্যায়! হ্যাঁ অন্যায়, মহা অন্যায়। আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ভেবে দেখো, স্কুলে তোমাকে যদি বলা হতো, তুমি আর বাংলায় পড়বে না, উর্দুতে পড়বে। বাংলায় কথা বলা নিষেধ। তবে তোমার

কেমন লাগত? সাফওয়ানের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। খুব খারাপ লাগত, দাদা। আমি তো উর্দু কিছুই জানি না! তাহলে কীভাবে পড়াশোনা করতাম? তাই সেই একই কথা ভেবে আমাদের বড়ো ভাইয়েরা তোমার মতোই ছাত্র, তারা প্রতিবাদ করল। ১৯৪৮ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল আন্দোলন। কিন্তু শাসকরা শোনেনি।

দাদা উঠে গেলেন ভিতরের ঘরে। একটু পরে ফিরে এলেন একটা পুরনো সাদা-কালো ছবি নিয়ে। ছবিতে রাস্তায় মিছিল, মানুষের ঢল।

এই দেখো, দাদা ছবিটা সাফওয়ানের হাতে দিলেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। সেই কালো দিন। কী হয়েছিল সেদিন? দাদা আবার বসলেন। এবার তাঁর গলা আরও ভারি। সে বছর সরকার ঘোষণা দিলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। মানে, চারজনের বেশি মানুষ জমায়েত হতে পারবে না। কোনো মিছিল, কোনো সভা কিছুই করা যাবে না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বলল, না, আমরা ১৪৪ ধারা ভাংব। আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তারপর?

তারপর সেদিন সকালে, একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় হাজার হাজার ছাত্র জমা হলো। তাদের হাতে ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, লেখা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাংলা ভাষার দাবি মানতে হবে' ইত্যাদি। সাফওয়ান শ্বাস বন্ধ হওয়ার মতো করে শুনছিল। দুপুর আড়াইটার দিকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল শুরু করল। রাস্তায় নেমে এল। স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেল। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!' পুলিশ বাধা দিল, লাঠিচার্জ করল। কিন্তু ছাত্ররা থামেনি। দাদার চোখ ভিজে এল। তখন পুলিশ গুলি চালালো। নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি!

সাফওয়ানের মুখ শুকিয়ে গেল। গুলি? সত্যি?

হ্যাঁ দাদুভাই। প্রথম গুলিতে পড়ে গেল রফিক উদ্দীন আহমেদ। মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বয়স মাত্র ২৬। তারপর আবুল বরকত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র। ১১ বছরের ছোট্ট ছেলে অহিউল্লাহ মা হারিয়ে ফেলেছিল, মিছিল দেখতে এসেছিল। এছাড়াও গুলিতে মারা গেল আবদুস সালাম, শফিউর রহমানসহ আরো অনেকে একে একে ঢলে পড়তে লাগল। এক পর্যায়ে ছোট্ট অহিউল্লাহও চলে গেল। আমার বয়সী ছেলেও? সাফওয়ান কাঁপা গলায় বলল। হ্যাঁ দাদুভাই। তোমার চেয়ে একটু বড়ো। রক্তে ভাসতে লাগল ঢাকার রাজপথ। মেডিকেল কলেজের সামনে, বর্তমান শহিদমিনারের যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, সেখানে রক্তের দাগ লেগে থাকল। সাফওয়ান চোখ মুছল। তারপর কী হলো দাদা?

তারপর, সারা দেশ জেগে উঠল। রাত নামার সাথে সাথে খবর ছড়িয়ে পড়ল,ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি, অনেকে শহিদ হয়েছেন। মানুষ রাস্তায় নেমে এল। আমাদের এই পুরান ঢাকাতেও মিছিল হলো। আমার বাবা তোমার পরদাদা সেই মিছিলে ছিলেন। মশাল হাতে মানুষের মিছিল। আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না স্লোগান। নারীরাও রাস্তায় নেমেছিলেন। চারিদিকে শোকের ছায়া, কিন্তু সাথে প্রতিরোধের আগুন।

পরদিন, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ছাত্ররা খালি পায়ে, খালি হাতে শহিদদের জন্য জানাজা পড়ায়। তারপর রাতের অন্ধকারে, কারফিউ ভেঙে, মেডিকেল কলেজের সামনে ইট-বালি দিয়ে তৈরি করল একটা স্মৃতিস্তম্ভ। প্রথম শহিদমিনার। সকাল হতেই পুলিশ এসে ভেঙে ফেলল। কিন্তু মানুষের মনে যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর ভাঙা যায়নি।

সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, তারপর কি সরকার মেনে নিয়েছিল? সাথে সাথে না। কিন্তু আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল সারা পূর্ব পাকিস্তানে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনায় সর্বত্র। মানুষ বুঝে গেল, বাংলা ভাষা মানে শুধু ভাষা নয়, এটা আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের পরিচয়। আর এই আন্দোলনই শেখালো, আমরা বাঙালি, আমাদের নিজস্ব পরিচয় আছে। এই চেতনা থেকেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ। সাফওয়ান গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। তারপর বলল, দাদা, এর ফলে আমাদের কী কী সুবিধা হয়েছে? আমি তো ভাবিনি কখনো।



দাদা হাসলেন। ভাবো দাদুভাই, এখন ভাবো। তুমি স্কুলে গিয়ে বাংলায় পড়ো। শিক্ষক বাংলায় বোঝান। তোমার বিজ্ঞানের বই, গণিতের বই, ইতিহাসের বই সব বাংলায়। তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি সব উর্দুতে হতো? তাহলে তো আমি কিছুই বুঝতাম না! ঠিক। শোনো, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের ফলে আমরা কী কী পেয়েছি,

প্রথমত শিক্ষার সুবিধা, তুমি, আমি, আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ নিজের ভাষায় শিক্ষা পাচ্ছি। গ্রামের একটা গরিব ছেলে, যে ইংরেজি বা উর্দু জানে না, সে-ও বাংলায় পড়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। বিজ্ঞানী হতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষা পেলে মেধার পূর্ণ বিকাশ হয় এটা প্রমাণিত সত্য। আজ আমাদের সরকারি অফিস-আদালতে, হাসপাতালে, ব্যাংকে সব জায়গায় বাংলা চলে। একজন সাধারণ কৃষক আদালতে গিয়ে বাংলায় তার অভিযোগ জানাতে পারে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে বাংলায় রোগের কথা বলতে পারে। আগে কি সম্ভব ছিল? সাফওয়ান মাথা নাড়ল, না দাদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীন, শামসুর রাহমান, এদের কবিতা, গান, গল্প আমরা পড়তে পারি। বাংলা চলচ্চিত্র, নাটক, গান আমাদের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরিচয়।

আমরা গর্ব করে বলতে পারি, 'আমরা বাঙালি।' আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ইতিহাস নিয়ে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। পৃথিবীর বুকে আমাদের একটা নিজস্ব স্থান আছে।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখন প্রতি বছর এই দিনটা পৃথিবীর ১৯৩ টা দেশে পালিত হয়। আমাদের ভাষা শহিদরা পৃথিবীকে

শিখিয়েছে, মাতৃভাষা কতটা মূল্যবান। সাফওয়ান অবাক হয়ে বলল, সত্যি দাদা? পুরো পৃথিবীতে?

হ্যাঁ দাদুভাই। আমেরিকা থেকে জাপান, ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র।

সাফওয়ান একটু ভেবে বলল, দাদা, আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম আয়ান। ওর বাবা বলেন, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে ভবিষ্যত ভালো হবে। বাংলা মিডিয়ামে পড়লে কিছু হবে না। এটা কি সত্যি? দাদার মুখ গম্ভীর হলো। এই প্রশ্ন অনেকেই করে। শোনো, আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বলি, প্রাথমিক শিক্ষা (ক্লাস ১-৫) অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। কারণ শিশুরা যে ভাষায় ঘরে কথা বলে, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে সেই ভাষায় লেখাপড়া শিখলে তাদের মেধা দ্রুত বিকশিত হয়। তারা সবজিনিস ভালো বোঝে এবং মনে রাখতে পারে। ইউনেস্কোও এটা বলে। মাধ্যমিক শিক্ষা (ক্লাস ৬-১০) মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, কারণ এই সময় ভিত্তি তৈরি হয়। বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস এসব বাংলায় শিখলে গভীরভাবে বোঝা যায়। তবে এই সময় ইংরেজি বিষয় হিসেবে খুব ভালোভাবে শিখতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়) বাংলায় হওয়া উচিত, তবে ইংরেজি বই, গবেষণাপত্রও পড়তে হবে। জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া এসব উন্নত দেশ নিজেদের ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেয়। তারা কি পিছিয়ে আছে? না। বরং তারা এগিয়ে। কারণ মাতৃ ভাষায় জ্ঞান সৃষ্টি হয়, উদ্ভাবন হয়।

তাহলে ইংরেজি মাধ্যম খারাপ?
না, খারাপ না। কিন্তু বুঝতে হবে, কেন পড়ছ। যদি বিদেশে পড়তে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে, বা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার করতে চাও, তাহলে ইংরেজি মাধ্যম ভালো। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইংরেজিতে পড়লেও বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলাদেশের ইতিহাস ভুলে যাওয়া যাবে না। শেকড় ছিন্ন হলে গাছ মরে যায়।

দাদা, সাফওয়ান বলল, তাহলে কি আমরা ইংরেজি, আরবি, এসব শিখব না? দাদা হেসে উঠলেন। অবশ্যই শিখবে! আরে বাবা, মাতৃভাষাকে ভালোবাসা মানে অন্য ভাষার বিরোধিতা করা নয়। বরং বলব, যত বেশি ভাষা জানবে, তত সমৃদ্ধ হবে। শোনো,ইংরেজি শিখবে কেন? এটা আজকের পৃথিবীর যোগাযোগের ভাষা। তুমি যদি আমেরিকার বিজ্ঞানী, জাপানের ইঞ্জিনিয়ার, ব্রাজিলের ফুটবলারের সাথে কথা বলতে চাও ইংরেজিতে বলতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক নতুন বই, গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। এগুলো পড়তে হলে ইংরেজি জানা লাগবে। ভালো চাকরি, আন্তর্জাতিক সুযোগের জন্য ইংরেজি দরকার।

কিন্তু মনে রেখো, ইংরেজি একটা হাতিয়ার, পরিচয় নয়। আরবি শিখবে কেন? আমরা মুসলমান। কোরান, হাদিস বোঝার জন্য আরবি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুবাদ পড়লে অনেক সময় মূল অর্থ হারিয়ে যায়। নামাজে আমরা আরবি পড়ি। এর অর্থ জানলে ইবাদতে মজা আসে। মধ্যপ্রাচ্যে কাজের অনেক সুযোগ আছে। আরবি জানলে সুবিধা হয়। চীনা ভাষা জানলে ব্যবসায়িক সুযোগ পাওয়া যায়। ফ্রান্স, কানাডায় কাজ করতে চাইলে ফরাসি দরকার। ল্যাটিন আমেরিকায় স্পেনিশ চলে। ভারতের সাথে ব্যাবসা করতে হিন্দি কাজে দেয়। কিন্তু মূল কথা হলো—

প্রথমে শেকড় মজবুত করো, বাংলা ভাষায় পারদর্শী হও। বাংলা সাহিত্য পড়ো, বাংলায় লেখো, বাংলায় চিন্তা করো। তারপর ডালপালা বিস্তার করো: ইংরেজি শেখো, আরবি শেখো, চাইলে আরও ভাষা শেখো। কখনো নিজেকে হারিও না, অন্য ভাষা জানা মানে নিজের ভাষাকে ভুলে যাওয়া নয়। কিছু মানুষ দেখবে, ইংরেজি শিখে বাংলা ভুলে যায়, বাংলা বলতে লজ্জা পায়। এটা মস্ত বড়ো ভুল। সাফওয়ান মাথা নাড়ল। বুঝলাম দাদা। মানে, বাংলা হলো আমার ঘর, আর অন্য ভাষা হলো বাইরের জানালা। জানালা দিয়ে পৃথিবী দেখব, কিন্তু ঘর ছেড়ে যাব না।

দাদা খুশিতে নাতিকে জড়িয়ে ধরলেন। ওয়াহ! একদম ঠিক বলেছ! ❑

শিক্ষার্থী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়



অমর একুশ

হানিফ রাজা

মধুমাখা বাংলা ভাষায়
মায়ের মুখের বোল,
পরম শান্তি মা ডাকেতে
নাই যে কোথাও তুল।

বাংলা মায়ের বুলি শুনে
জুড়ায় মোদের প্রাণ,
রক্তে লেখা বর্ণমালায়
পাই শহিদের ঘ্রাণ।

ভাষার তরে জীবন দিলো
সালাম, রফিক ভাই,
প্রাণের ত্যাগে ভাষা বিপ্লব
বিশ্ব মাঝে নাই।

রক্তে রাঙা শহিদমিনার
ফেব্রুয়ারির দিন,
শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি
শোধ হবে কি ঋণ।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি
ভাষা দিবস আজ,
বিশ্ব মাঝে বাংলা ভাষা
রক্ষা মোদের কাজ।

বাঙালির জাগরণ

মো. মাহফুজুল ইসলাম

বাহান্নর রক্তে লেখা বাঙালির জাগরণ,
একুশের সেই শিক্ষা দিল নতুন জীবন।
ভাষার জন্য জীবন দেওয়া ছিল যে শুরু,
স্বাধীনতার পথে সেটাই হলো গুরু।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সেই ধারার ফল,
বাংলার মানুষ লড়লো হয়ে একতাবদ্ধ দল।
বাহান্ন থেকে একাত্তর- একই পথের গান,
স্বাধীনতার ইতিহাসে লেখা আছে সেই প্রমাণ।

ভাষার প্রেমেই জেগেছিল জাতির চেতনা,
স্বাধীনতার পথে দিল নতুন প্রেরণা।
শহিদেরা রেখে গেছে অমর সেই দান,
বাংলা ভাষা আর স্বাধীনতা একই প্রাণ।

আজও সেই ইতিহাস বেঁচে আছে মনে,
বাংলার স্বাধীনতা গাঁথা সেই সুরে।
একুশের সেই শিক্ষা রাখব বুকে,
বাংলার জয়গান বাজুক সুখে।



বাংলা বর্ণমালা

নকুল শর্ম্মা

ভাষার জন্য এত লড়াই
এমন নজির নাই,
মধু ঝরা আমার মায়ের
বাংলা ভাষা ভাই।

বিশ্বের বুকে ঝড় তুলেছে
আমার মায়ের ভাষা,
স্বপ্ন দেখি এই ভাষাতেই
পুরাই যত আশা।

দশ দিগন্ত উঠল কেঁপে
ভাষার দাবির জোরে,
কেউ পারেনি রুখতে দাবি
বীর বাঙালির তোড়ে।

রক্তের দামে কেনা হলো
বাংলা বর্ণমালা,
হাজার কথার ফুলঝুরিতে
জুড়াই মনের জ্বালা।

বাংলা আমার বুলি

মমতা মজুমদার

বাংলা আমার মায়ের বুকে
গড়া সুখের বুলি
এই ভাষাতে স্বপ্ন সাজাই
হৃদয় দুয়ার খুলি।

বাংলা আমার বাবার চোখে
অনেক মধুর স্মৃতি
এই ভাষাতে বাঙালির আজ
হলো স্বজন-প্রীতি।

বাংলা আমার স্বাধীন দেশের
রক্তে ভেজা মাটি
এই ভাষাতে কথা বলেই
মনটা হলো খাঁটি।

বাংলা আমার ভাইয়ের রক্তে
আঁকা দেশের ছবি
এই ভাষাতে লাল-সবুজের
বুকে হলাম কবি।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সুমন প্রামানিক

ভাষা মানুষের পরিচয়ের অন্যতম প্রধান উপাদান। একটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আবেগ ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের গর্ব। এই ভাষার জন্যই আমরা সারাবিশ্বে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছি। আর সেই গৌরবময় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, যা প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয়।

বাংলা ভাষার ইতিহাস অনেক পুরনো ও সমৃদ্ধ। হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে। এই ভাষায় সাহিত্য, গান, কবিতা, নাটকসহ নানা ধরনের সৃষ্টিকর্ম রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের অনুভূতি, চিন্তা ও স্বপ্ন প্রকাশ করি। তাই মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

কিন্তু এই ভাষার মর্যাদা অর্জন এত সহজে আসেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সে সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষ তা মেনে নিতে পারেনি। তারা তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনে নামে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতা মিছিল করে। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায় এবং সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকেই শহিদ হন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

এই ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিশ্বব্যাপী ভাষার অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের মানুষ মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নিজের ভাষাকে ভালোবাসা ও রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আজকের বিশ্বায়নের যুগে অনেকেই বিদেশি ভাষার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষা শেখা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাই বলে নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করা ঠিক নয়। আমাদের উচিত বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং এর শুদ্ধতা বজায় রাখা।

বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব শুধু কথায় নয়, কাজে প্রকাশ করতে হবে। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজ–সবখানেই বাংলা ভাষার চর্চা বাড়াতে হবে। শিশুদের ছোটোবেলা থেকেই বাংলা পড়া, লেখা ও বলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। বাংলা বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললে ভাষার প্রতি ভালোবাসা বাড়বে। পাশাপাশি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়ানো জরুরি। ইন্টারনেট, মোবাইল অ্যাপ ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদের ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদেরকে অন্য ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষা রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটিই একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। তাই সব ভাষার প্রতি সম্মান দেখানো এবং সেগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করা আমাদের সবার দায়িত্ব। ভাষার বৈচিত্র্যই পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

বাংলা ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের আবেগ ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক। ভাষা আন্দোলনের শহিদরা তাদের জীবন দিয়ে আমাদের এই ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তাদের এই আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা যদি বাংলা ভাষাকে অবহেলা করি, তাহলে তাদের সেই ত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে।

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করছে। তারা বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে। ফলে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করে।

বাংলা ভাষা আমাদের অহংকার, আমাদের পরিচয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের সেই গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের উচিত এই ভাষাকে ভালোবাসা, সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা। তাহলেই আমরা ভাষা শহিদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানাতে পারব এবং আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারব। ❑

সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক নাগরিক সংবাদ

গল্প

একুশের মিছিল

আনোয়ারুল ইসলাম

ভোরটা ছিল খুবই শান্ত। ঢাকা শহরের আকাশে তখনো রোদের আলো পুরোপুরি ছড়ায়নি। কিন্তু রাজপথের বাতাসে একটা অদৃশ্য উত্তেজনা- ভাষা যেন নিজেই কথা বলতে চাইছে।

সালাম আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে। মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে বাড়িতে এল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুই বলল না। শুধু ব্যাগে একটা কাগজ ভাঁজ করে রাখল। আর ভাঁজ করা কাগজে লেখা– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'





মা জানতেন, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। ছেলেকে আটকানোর শক্তি ও সাহস তার নেই। শুধু বললেন, 'বাবা, সাবধানে যেও।'

সালাম হ্যাঁ-সূচক সম্মতিতে মাথা নেড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে জড়ো হচ্ছে ছাত্ররা। কারো হাতে প্ল্যাকার্ড, কারো চোখে ভয়ের আগুন, কারো বুকের ভেতর চাপা ভয়। তারা সবাই একসাথে অবস্থান করছে। কারণ, ভাষা একা থাকে না— ভাষা মানুষকে এক করে।

মিছিল শুরু হলো।

--রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মরতে জানি, ভয় নাই।

স্লোগানে কেঁপে উঠল রাস্তা, গাছপালা ও আকাশ বাতাস।

হঠাৎ সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। থামার নির্দেশ। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাংলার দামাল ছেলেরা এগিয়ে গেল। ভাষার আন্দোলন কী থেমে থাকে?

একটা গুলির শব্দ। তারপর আরেকটা। এভাবে চলতে থাকে পরপর। সালাম গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকের বুকে গুলি লাগল। চারপাশে চিৎকার, দৌড় আর রক্ত স্রোত বইছে। সালাম আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবল, ' মা আমি বাংলায়ই শেষ কথা ভাবছিলাম।'

পরদিন একটু দেরিতে সূর্য উঠল। শহিদমিনারের সামনে সাজানো ফুল। লাল রঙের ফুল, সাদা পাপড়ি মাঝখানে— রক্ত আর স্বপ্ন একসাথে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিক নেই, কিন্তু তাদের মুখের ভাষা আছে। তাদের কণ্ঠস্বর আছে— বিশ্বের প্রতিটি দেশের বাংলা ভাষাভাষীর মুখে।

আজও যখন কেউ কিছু বলে, বাংলা আমার মাতৃ ভাষা, তখন একুশের সেই মিছিল আবার হাঁটে -- নীরবে, গর্বে, রক্তের স্মৃতিতে। আর সেই মিছিলে স্মৃতিময় গীত হয়ে ওঠে এই গানটি—

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

বাংলা ভাষার গল্প

জাকির সেতু

নাগডেমরা গ্রামের পাশ দিয়ে একে একে বয়ে গেছে বড়াল নদী। নদীর দুপাশে সারি সারি বাড়ি, গাছপালা ও ফসলি জমি। এই বড়াল নদীর তীরে রামিনদের বাড়ি। রামিনের আরও দুই বোন আছে উরশিয়া ও অর্নিলা। তিন বোন মিলে সব সময় একসাথে



খেলাধুলা করে, একসাথে পলাশ ও শিমুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথে। তিন বোন খুবই দুরন্ত প্রকৃতির।

তাদের বাবা রুহুল আমিন একজন শিক্ষক। তিনি সবসময় তিন মেয়েকে উপদেশ দেন। তিন বোন মাঝে মাঝে বাবার কাছে আবদার করে, আর বাবা সব সময় তাদের আবদার পূরণ করেন।

এক বিকেলে রামিনের হাতে অনেকগুলো শিমুল ফুল। বাবা জিজ্ঞেস করলেন শিমুল ফুল দিয়ে কী করবে রামিন? রামিন বলল, বাবা মালা গেঁথে আমরা তিন বোন গলায় দিব।

এদিকে উরশিয়া এসে বাবার পাশে বসল। বাবা তিনজনকে কাছে ডাকলেন। বাবা অর্নিলাকে জিজ্ঞেস করলেন এই মাসের নাম কী? তুমি বলতে পারবে? অর্নিলা বলল হ্যাঁ বাবা পারব। এটি হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস।

রামিন সুন্দরভাবে ছোটো বোন অর্নিলাকে বলল ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস। এই ভাষার জন্য আমাদের বাংলার সন্তানরা জীবন দিয়েছে। তাদের আত্মত্যাগের জন্য আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা। বাবা তাদের কথা শুনে খুব খুশি হলেন। এদিকে উরশিয়া বলল একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিবস উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের শহিদ ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সকালবেলা খালি পায়ে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাবাকে উদ্দেশ্য করে উরশিয়া বলল, বাবা আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছি। অনেকগুলো পতাকা ও অক্ষর দিয়ে আমরা শহিদমিনার তৈরি করব। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। সাথে থাকবে দাদু ভাই আকাশ ও মিঠু ভাই।

তাদের কথা শুনে বাবা বললেন তোমরা অনেক কিছু জেনেছ। জেনে সত্যিই আমি আনন্দিত হলাম। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে একটি শোকের মাস। আমরা আমাদের ভাষার জন্য সংগ্রাম করে জীবন দিয়েছি। এটা ইতিহাসের গর্ব ও সম্মানের বিষয়, যা অন্য কোনো জাতি কখনোই করেনি।

বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে তিন বোন শুনল। রামিন বলল, আমার বাগানে অনেকগুলো গাঁদা ও গোলাপ ফুল আছে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আমি এই ফুলগুলো দিয়ে সুন্দর করে মালা গেঁথে শহিদমিনারে অর্পণ করব।

উরশিয়া বলল সাথে শিমুল ও পলাশ ফুল দিয়ে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি বানিয়ে দিলে আরও ভালো হবে।

অর্নিলা বলল তাহলে আমাদের আগেই পরিকল্পনা করতে হবে।

বাবা বললেন, তোমরা তোমাদের সহপাঠীদের সঙ্গে সুন্দর করে শহিদমিনার তৈরি করবে এবং শহিদমিনারে পুষ্প অর্পণ করবে।

রামিন বলল বাবা, আমার একটি আবদার আছে। একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে আমাদের তিন বোনকে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস সম্পর্কে বই কিনে দিতে হবে।

বাবা তাদের উৎসাহ দেখে বললেন অবশ্যই তোমাদের বই কিনে দেবো, যাতে তোমরা ফেব্রুয়ারি মাস এবং ভাষার ইতিহাস আরও ভালোভাবে জানতে পার।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগল। রামিন উরশিয়া ও অর্নিলা তিন বোন একটি ছড়া সুর করে পড়তে লাগল—

ফাল্গুনে শুরু হয় গুনগুনানি,
ভোমরাটা গায় গান ঘুম ভাঙানি।
একঝাঁক পাখি এসে ঐকতানে,
গান গায় একসাথে ভোরবিহানে।
আযানের সুর মেশে নীল আকাশে,
শিরশির করে ঘাস, হিম বাতাসে।

তাদের কণ্ঠে এই ছড়া বাতাসে ভেসে যেতে লাগল স্নিগ্ধ সতেজ ফুল হয়ে সন্ধ্যার আকাশে। ❑

গল্পকার



বাংলা ও বিশ্বের হাজারো ভাষা

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বন্ধুরা, তোমরা তো জানো পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা আছে। প্রতিটি ভাষারই রয়েছে আলাদা সুর, আলাদা মাধুর্য। কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভাষা কোনটি বলো তো? অবশ্যই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। মা যখন আমাদের ভাষায় আদর করে ডাকেন, কিংবা যখন আমরা মনের সবটুকু আনন্দ দিয়ে বন্ধুদের সাথে গল্প করি- তখন এই বাংলা ভাষাই হয়ে ওঠে আমাদের প্রাণের স্পন্দন।

আমাদের ভাষা এত বিশেষ হওয়ার কারণ হলো– পৃথিবীর আর কোনো জাতিকে তাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এভাবে লড়াই করতে হয়নি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাইয়েরা (সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বারসহ আরো অনেকে) রাজপথে নেমেছিলেন শুধু একটি দাবির জন্য– যেন আমরা আমাদের প্রিয় ভাষায় কথা বলতে পারি। তাদের সেই ত্যাগের কথা মনে রেখেই ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে।

ভাষা তো কেবল কথা বলা নয়, ভাষা হলো একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। ভাষা নিয়ে আমাদের কিছু ছোটো ছোটো অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। যেমন– নতুন শব্দ শেখা ও প্রয়োগ, স্পষ্ট উচ্চারণ, বেশি বেশি ও নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাস, সঠিক উচ্চারণ ও বানান সচেতনতা, আঞ্চলিকতা ও প্রমিত ভাষার ভারসাম্য প্রভৃতি। পৃথিবীটা যেমন বিশাল, এর ভাষাগুলোও ঠিক ততটাই বৈচিত্র্যময়। মানুষ যখন থেকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই তৈরি হয়েছে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম– ভাষা। চলো আমরা জেনে নেই পৃথিবীর সকল ভাষা ও বাংলা ভাষা সম্পর্কীয় কিছু তথ্যসমূহ–

পৃথিবীতে বর্তমান ভাষার সংখ্যা

ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং 'এথনোলগ' (Ethnologue) -এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে

পৃথিবীতে প্রায় ৭ হাজারেরও বেশি ভাষা রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে এমন প্রধান ভাষাগুলো হলো ইংরেজি, মান্দারিন (চীনা), হিন্দি, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, পর্তুগিজ, রুশ, উর্দু, জাপানি প্রভৃতি।

হারিয়ে যাওয়া ভাষা

ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যায়, শত শত ভাষা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইউনেস্কোর মতে, বিশ্বে প্রতি ১৪ দিনে একটি করে ভাষা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে। গত ৬০ বছরে প্রায় ২৩০টিরও বেশি ভাষা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। প্রতিটি



ভাষা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, জ্ঞান, সংস্কৃতি– সেই ভাষার শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বিলুপ্তপ্রায় ভাষার সংকট

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার প্রায় ৪০ শতাংশ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। অনেক ভাষা এমনও আছে যা মাত্র হাতে গোনা ১০-১৫ জন মানুষ বলতে পারেন। তারা হারিয়ে গেলে সেই ভাষাগুলোও হারিয়ে যাবে। একটি ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে একটি গোটা জাতির পরিচয় হারিয়ে যাওয়া। তাই নিজের ভাষাকে ভালোবাসা এবং চর্চা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা

জাতিসংঘের দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল ভাষা মোট ৬টি। ভাষাগুলো হলো: আরবি, চীনা (মান্দারিন), ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্প্যানিশ।

বিশ্বে আমাদের বাংলা ভাষার অবস্থান

২০২৬ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান (Ethnologue) এবং বিভিন্ন ভাষা গবেষণা সংস্থার জরিপ অনুযায়ী, পৃথিবীতে ভাষার অবস্থানের র‍্যাঙ্কিং দুটি পদ্ধতির একটি হলো- মাতৃভাষী মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী, বাংলা বিশ্বের ৫ম বা ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অর্থাৎ যারা মাতৃভাষা হিসেবে কথা বলেন সে অনুযায়ী, বাংলা ভাষা বিশ্বের ৭ম অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ২৮ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এর মধ্যে প্রায় ২৪-২৫ কোটির বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাকি প্রায় ৩-৪ কোটি মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করেন।

একটি মজার তথ্য হলো, সিয়েরা লিওন (Sierra Leone) নামক পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ ২০০২ সালে বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম 'সম্মানসূচক দাপ্তরিক ভাষা' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানের সম্মানে এ ঘোষণা করা হয়।

ভাষা হলো মনের আয়না। আমরা যত বেশি সুন্দর ভাষায় কথা বলব, আমাদের মনটাও তত সুন্দর হয়ে উঠবে। তাই বন্ধুরা– আমরা সবসময় শুদ্ধ করে কথা বলব, শুদ্ধ করে বাংলা লিখব এবং আমাদের এই প্রিয় বাংলা ভাষাকে সারা বিশ্বের কাছে গর্বের সাথে তুলে ধরব। ❑

তথ্যসূত্র: ইউনেস্কো (UNESCO), এথনোলগ (Ethnologue)

অন্যরকম ভালোবাসা

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নিভৃত একটি গ্রাম চৈতন্যপুর। শহর থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরের এই গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই, শহিদমিনারও নেই। তবে পাশের কান্তপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে শহিদমিনার। দুই গ্রামের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার ।

কৃষক মনিরুজ্জামানের বাসা রাজশাহী নগরের মহিষবাথান মহল্লায়। তিনি চৈতন্যপুরে এক ফসলি জমিতে নতুন নতুন ফসলের চাষাবাদ করেন। এ জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জমিতে ফুলের চাষও করেন।কৃষক মনিরুজ্জামান বরাবরই গ্রামের শিশুদের নিয়ে ব্যতিক্রমী সব আয়োজন করেন।২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ শনিবার সকাল সাতটা থেকেই শিশুরা কৃষক মনিরুজ্জামানকে সাথে নিয়ে তার জমির গাঁদাফুল তুলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে জমি থেকে তিন ঝুড়ি ফুল তুলে শিশুরা। এসব ফুল নিয়ে তাদের তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হবে।শিশুদের হাতে ফুলের ঝুড়ি। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তাদের ভাষা আন্দোলনের গল্প শোনাতে শোনাতে সাথে হেঁটে যায় কৃষক মনিরুজ্জামান। চৈতন্যপুর থেকে গ্রামের শিশুদের নিয়ে তিনি কান্তপাশার শহিদমিনারে গিয়ে উপস্থিত হয়। অন্যান্য গ্রাম থেকেও আসে অনেক শিশু। সব শিশুর হাতে একটি করে গাঁদাফুল দেওয়া হয়। সেই ফুল দিয়ে তারা সবাই শহিদমিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এভাবেই বিভিন্ন জাতীয় দিবসে কৃষক মনিরুজ্জামান মুখে মুখে শিশুদের ইতিহাস শেখান।

গ্রামীণ শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগানো, গল্পে গল্পে ইতিহাস শোনানো, নিজ হাতে



শহীদ মিনার তৈরি এ ধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ প্রথাগত পুষ্পস্তবক অর্পণের বাইরে গিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের চেতনা পৌঁছে দেয়। সেই সাথে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা তরুণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয়ে গেঁথে দেয়।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ



কবিতা

শহিদদের ঋণ

মো. ইউনুছ আলী

শহিদদের স্মরণ করি
গভীর ভালোবাসায়,
তাদের ত্যাগেই বাংলা আজ
বিশ্বজুড়ে হাসায়।

শহিদমিনার দাঁড়িয়ে আছে
ইতিহাসের সাক্ষী,
রক্ত দিয়ে লেখা সেই
গৌরবেরই পাখি।

বাংলা ভাষা চির অমর
থাকবে যুগে যুগে,
মায়ের ভাষা হৃদয় জুড়ে
থাকবে অনুরাগে।

অ আ ক খ নিয়ে বেড়াচ্ছি ঘুরে

মাসুম আওয়াল

পৃথিবী জুড়ে যত প্রাণী আছে সকলের আছে ভাষা
ভাষা মানে সুর আপন ছন্দ হৃদয়ের ভালোবাসা
বুকের ভেতরে লুকোনো কথারা ভাষা হয়ে ঝরে ঠোঁটে
রোজ ফুল হাসে, ফুলও কথা বলে পাঁপড়ি ছড়িয়ে ফোটে।

বিশাল পৃথিবী চোখ মেলে দেখি কত ভাষা কত দেশ
বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়ে সহজে হবে না শেষ
কত ভাষা আর কত সুর দিয়ে চারপাশ আছে ঘেরা
আমাদের প্রিয় বাংলাভাষা সকল ভাষার সেরা।

ঊনিশ'শ বায়ান্ন সাল খুব বেশি দূরে নয়,
রফিক, সালাম, শফিকের কথা মনে আছে নিশ্চয়।
বিলিয়েছে তারা বাংলা ভাষার জন্য নিজের প্রাণ
লাল গোলাপের বুক থেকে মেলে তাদের রক্তের ঘ্রাণ।

ফাগুনে শিমুল-পলাশ ফুটেই তাদের গল্প বলে,
তাদের ত্যাগের গল্প শুনলে দুই চোখ ভরে জলে,
জন্মেছি এই বাংলায় আমি তাদের ভুলতে পারি!
আমি গর্বিত আমাদের আছে একুশে ফেব্রুয়ারি।

আমি গর্বিত বাংলাতে গাই বাংলায় কথা বলি,
অ আ ক খ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পৃথিবীর অলি-গলি।

মাতৃভাষার গান

মো. রিফাত হাসান

মায়ের ভাষা মধুর সুরে
বাজে প্রাণের মাঝে,
একুশ এলে সেই সুরটা
আরো জোরে বাজে।

ভাষার জন্য যারা
দিল অমূল্য প্রাণ,
তাদের ত্যাগে আজকে
গাই বাংলারই গান।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
আজ বাংলারই গর্ব,
মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা
সবারই কর্তব্য।



এক শহরের দুই ভাষা

মো. শরীফুল ইসলাম

ভাষা মানুষের এক চিরন্তন আবেগের নাম। আবার মানুষের আবেগ-অনুভূতির সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক জাতি। তবে ভাষার অধিকার আদায়ে প্রাণ বিসর্জনের অতুলনীয় ইতিহাস কেবল বাংলা ভাষার ভাগ্যেই জুটেছে।

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। এখানেই শেষ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির বিদ্রোহের প্রথম স্ফুরণ ঘটে ভাষাকে কেন্দ্র করে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বাঙালির সব আন্দোলন সংগ্রামে জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলন। আর স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে বাংলা পেল রাষ্ট্রভাষার সম্মান। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা হলেও ৬৪ জেলার আছে আঞ্চলিক ভাষা।ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান ইথনোলগ- এর সর্বশেষ প্রকাশনায় জানানো হয়েছে বাংলাদেশে মোট ভাষার সংখ্যা হচ্ছে ৪২।প্রতিটি জেলার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা থাকলেও রাজধানী ঢাকায় রয়েছে পুরাতন একটি ভাষা ।ভাষাটি অনেকের কাছেই অজানা। আজ সেই ভাষা সম্পর্কে বন্ধু তোমাদের জানাবো।

এই ভাষার নাম হলো সোব্বাসী সোব্বাসী হলো একটি ঢাকাইয়া গোষ্ঠী, যারা সোব্বাস ভাষায় কথা বলে। এ ভাষা মূলত ১৪টি ভাষার মিশ্রিত রূপ। সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে ঢাকায় এসেছিলেন

বিরাট এক বহর নিয়ে। এই আগমন পরবর্তী সময় আরও প্রায় ২৫০ বছর চলতে থাকে। এই ব্যাপক জনগোষ্ঠী বর্তমান পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেছিল। এরাই হলো আদি বা আসলি ঢাকাইয়া। অনেকেই ঢাকাইয়া কুট্টিদের 'আদি ঢাকাইয়া' হিসেবে জানেন। কুট্টি এবং সোব্বাসী দুটোই পুরো পৃথক গোষ্ঠী।এই আদি অধিবাসীরা সোব্বাসী কথ্য ভাষায় পরিবারে, সমাজে, হাট-বাজারে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কথাবার্তা বলে। তবে ঠিক কত মানুষ এই ভাষা ব্যবহার করে, তার হিসাব কখনো করা হয়নি। এই মিশ্রিত ঢাকাইয়া ভাষাকে বর্তমানে আদি ঢাকাইয়ারা 'সোব্বাসি' ভাষা বলে এবং নিজেদেরকে 'সোব্বাস/সোব্বাসি' বলে পরিচয় দেন। বর্তমানে ঢাকায় সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, বংশাল, চকবাজার, লালবাগ থানার অন্তর্গত বিভিন্ন মহল্লায় বর্তমানে সোব্বাসিরা বসবাস করছে। সোব্বাস শব্দটি এসেছে সুখবাস থেকে। সোব্বাস ঢাকাইয়ারা 'সুখ'কে বলে 'সোখ'। সুখে বাস করে বলে তাদের সুখবাস বলা হয়। সুখবাস থেকে সোখবাস, আর তা থেকে সোব্বাস। অর্থাৎ, সুখবাস> সোখবাস> সোববাস> সোব্বাস> সোব্বাসী। ঠিক যেমন 'চাঁদনী ঘাট' থেকে 'চান্নিঘাট', 'রায় সাহেব বাজার' থেকে 'রাসাবাজার', 'শেখ সাহেব বাজার' থেকে 'সিক্সাবাজার' হয়েছে ঢাকার কথ্য ভাষার মিশ্রণ প্রসঙ্গে ড. কানিজ-ই-বাতুল বাংলা পিডিয়ায় লিখেছেন, 'আঠারো শতকে ঢাকা চাল ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল এবং ব্যবসায়ীরা ছিলেন মাড়োয়ারি। তাঁরা বাংলাভাষী চাল বিক্রেতাদের সঙ্গে হিন্দুস্তানি বা রিখতা ভাষায় কথা বলতেন। তা ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি সভা ও কোর্ট-কাচারিতে হিন্দুস্তানির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।' অর্থাৎ ১৬১০ সাল থেকেই ঢাকায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে মিশ্রিত হিন্দুস্তানি ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

ঢাকায় প্রচলিত সোব্বাসি কথ্য ভাষা একটি নাগরিক বা নগর উপভাষা হওয়ার পরও এটির উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে গবেষণা কম হওয়ার কারণ হলো এই ভাষার প্রাচীন কোনো নমুনা না থাকা। যেহেতু এটি কথ্য ভাষা, তাই লিখিত নমুনা না থাকাই স্বাভাবিক। ঢাকার ভাষার প্রাচীন যে নমুনা পাওয়া যায় গ্রিয়ারসনের ১৮৯৮ সালের, তা মানিকগঞ্জের ভাষার। সোব্বাসিরা বংশপরম্পরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে এই ভাষা এবং ভাষার ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়া ১৬১০ সাল থেকেই চলমান। সোব্বাসি ভাষা কখনোই কোনো বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হয়নি। তবে ইদানীং বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে সোব্বাসি ভাষায় লেখালেখি হচ্ছে এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২১ সালে 'বাংলা-ঢাকাইয়া সোব্বাসি ডিকশনারি' নামে সোব্বাসি ভাষার অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।

সোব্বাসি ভাষার জটিল বিষয়গুলোর একটি 'া' (আ-কার)। ঢাকাইয়া সোব্বাসিরা দুই রকমের 'া' (আ-কার) উচ্চারণ করে; একটি জোর দিয়ে আরেকটি আস্তে, নরম সুরে। যেমন 'আকাশের মেঘ'-এর সোব্বাসি 'আসমানকা আবার'; এখানে 'আসমানকা' শব্দে প্রতিটি 'া' (আ-কার) জোর দিয়ে উচ্চারিত হবে আর 'আবার' প্রতিটি 'া' (আ-কার) আস্তে, নরম সুরে উচ্চারিত হবে। এই 'া' (আ-কার)এর উচ্চারণের কারণে যারা সোব্বাসি ভাষা জানে না তাদের সোব্বাসি শব্দ উচ্চারণে সমস্যা হতে পারে। সোব্বাসি শব্দে 'ই'এবং 'ি' (ই-কার)-এর ব্যবহার ক্ষেত্রভেদে 'এ'এবং 'ে' (এ-কার)-এ বিবর্তিত। যেমন- 'ই'-এর স্থলে 'এ': এলেম, এমাম, এজহার, এরাদা, এজারা, এজ্জাত, এজারবান্দ, এংরেজ, এন্তেজাম, এন্তেজার, এন্তেকাল ইত্যাদি। 'ি' -এর স্থলে 'ে': কেরায়া, খেলাফাত, গেলাস, ঘেন, চেকনা, জেকার ইত্যাদি। সোব্বাসিরা চন্দ্রবিন্দু খুব কমই ব্যবহার করে এবং যেকোনো শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করে। যেমন– 'চাঁন খার পুল'কে দ্রুত বলে 'চাংখাকাপোল'। ঠিক তেমনি 'ঊ-কার', 'ঈ-কার', 'শ' -এর ব্যবহার কম। 'শ', 'স'– উভয়কেই অধিকাংশ শব্দে 'স'-এর মতো উচ্চারণ করে।

পুরান ঢাকার ভাষা দুই ধরনের– সোব্বাসি ও কুট্টি। দুটিই ঢাকার নগর উপভাষা হলেও, এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা। শব্দ এবং উচ্চারণে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। এ দুটোকে এক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

যেমন –

বাংলা : কুঁজোর আবার চিত হয়ে ঘুমানোর শখ।
সোব্বাসি : কুজাকা ফের চেত হোকে শোনেকা শাওখ।
কুষ্টি : গুজারবি আবার চিত অয়া হুইবার সক।

বাংলা : বসতে দিলে ঘুমাতে চায়।
সোব্বাসি : বায়েটনে দেনেসে শোনে মাঙতা।
কুষ্টি : বইবার দিলে হুইবার চায়।

সোব্বাসিরা পুং এবং স্ত্রী লিঙ্গ সূচক আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। যেমন-

বাংলা: আমার বোন ভাত খাবে।
সোব্বাসি: মেরা বাহেন ভাত খাগি।

বাংলা: আমার ভাই ভাত খাবে।
সোব্বাসি: মেরা ভাই ভাত খাগা।

বাংলা: মা ডাকছে।
সোব্বাসি: আম্মা/আম্মাজান বোলারাহি।

বাংলা: বাবা ডাকছে।
সোব্বাসি: আব্বা/আব্বাজান বোলারাহা।

বাংলা: তাবরেজ আগামীকাল আসবে।
সোব্বাসি: তাবরেজ আতাকাল আগা।

বাংলা: সীমা আগামীকাল আসবে।
সোব্বাসি: সীমা আতাকাল আগি।

ভাষা প্রবহমান নদীর মতো; চলার পথে যা পায়, তাকেই সঙ্গী করে সামনের দিকে ধাবিত হয়, পেছনে ফেরার উপায় নেই। প্রতিনিয়তই সোব্বাসি ভাষায় নতুন শব্দের সমাহার হচ্ছে আবার অনেক পুরনো শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। তথাপি বলা যায়, একটি নাগরিক বা নগর উপভাষা হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত সোব্বাসি কথ্য ভাষার যে যাত্রা ঢাকায় ১৬১০ সালে হিন্দুস্তানি কথ্য ভাষা থেকে শুরু হয়েছিল, তা বিভিন্ন ভাষার প্রভাবে বিবর্তিত হয়ে এখনো ঢাকার বুকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এটি এমন একটি নগর উপভাষা, যাকে বলা যায় একটি মিশ্রিত কথ্য হিন্দুস্তানি উপভাষা থেকে বিবর্তিত আরেকটি মিশ্রিত কথ্য নগর উপভাষা।





বসন্তের আগমনে

সাফায়েত কবীর

ফাল্গুনের কুয়াশা ঘেরা সকালের হাত ধরেই আগমন ঘটে ঋতুরাজ বসন্তের। এসময় শীতের আবেশ কাটিয়ে প্রকৃতির নতুনরুপে জেগে উঠা। গাছে গাছে নতুন পাতা, পলাশ-শিমুল গাছে রঙের খেলা, কোকিলের কুহু কুহু ডাক আর এসব হলেই বুঝতে হবে বসন্ত এসে গেছে। তাই তো ঋতুরাজকে স্বাগত জানাতে প্রকৃতির এত বর্ণিল সাজ। প্রকৃতির মতো বসন্তের আগমনে মানুষের হৃদয়েও বসন্তের দোলা জাগে।

ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম,বর্ষা শরৎ, হেমন্ত শীত ও বসন্ত। এই ছয়টি ঋতুর শেষ ঋতু বসন্ত। যা ফাল্গুন -চৈত্র মাস নিয়ে হয়। বাংলা বছরের শেষ ঋতু বসন্তের প্রথম দিনকে বাঙালি পালন করে 'পহেলা ফাল্গুন বা বসন্ত উৎসব' হিসেবে। এটি বাঙালির নিজস্ব সার্বজনীন প্রাণের উৎসব। এ উৎসব এখন গোটা পৃথিবীর বাঙালির কাছে ব্যাপক সমাদৃত। বাংলায় বসন্ত উৎসব এখন প্রাণের উৎসবে পরিণত হলেও এর শুরুর একটা ঐতিহ্যময় ইতিহাস আছে, যা অনেকেরই অজানা।

মোগল সম্রাট আকবর প্রথম বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেন। নতুন বছরকে কেন্দ্র করে ১৪টি উৎসবের প্রবর্তন করেন তিনি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বসন্ত উৎসব। তখন অবশ্য ঋতুর নাম এবং উৎসবের ধরনটা এখনকার মতো ছিল না। তাই পহেলা ফাল্গুন বা বসন্ত উৎসব কেবল উৎসবে মেতে ওঠার সময় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্য, বাঙালিসত্তা। সে ঐতিহ্যের ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারলেই বসন্ত উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্ম ছড়িয়ে দিতে পারবে বাঙালি চেতনাকে।

নতুন রূপে প্রকৃতিকে সাজায় ঋতুরাজ বসন্ত। শীতের খোলসে ডুবে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল পলাশ এসময় অলৌকিক স্পর্শে জেগে উঠে। মৃদুমন্দা বাতাসে ভেসে আসা ফুলের গন্ধে বসন্ত জানিয়ে দেয়, সত্যি সত্যি সে ঋতুর রাজা। লাল আর হলুদের বাসন্তী রঙে প্রকৃতির সাথে নিজেদের সাজিয়ে আজ বসন্তের উচ্ছলতা ও উন্মাদনায় ভাসে বাঙালি।

বসন্ত অনেক ফুলের বাহারে সজ্জিত হলেও গাঁদা ফুলের রংকেই এদিন তরুণ-তরুণীরা তাদের পোশাকে ধারণ করে। খোঁপায় শোভা পায় গাঁদা ফুলের মালা। বসন্তের আনন্দ উৎসব থেকে বাদ যায় না গ্রাম্যজীবনও। আমের মুকুলের সৌরভে আর পিঠাপুলির গন্ধে গ্রামে বসন্তের আমেজ একটু বেশিই ধরা পড়ে। বসন্তকে সেখানে আরও নিবিড়ভাবে বরণ করা হয়।

বসন্ত শুধু অশোক-পলাশ-শিমুলেই উচ্ছ্বাসের রং ছড়ায় না, আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্ত রঙিন পুষ্পিত রক্তের স্মৃতির ওপরও রং ছড়ায়। ১৯৫২ সালের আট ফাল্গুন বা একুশের পলাশরাঙা দিনের সঙ্গে তারুণ্যের সাহসী উচ্ছ্বাস আর বাঁধভাঙা আবেগের জোয়ার যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।



বঙ্গাব্দ ১৪০১ সাল থেকে প্রথম 'বসন্ত উৎসব' উদযাপন করার রীতি চালু হয়। সেই থেকে জাতীয় বসন্ত উৎসব উদযাপন পরিষদ বসন্ত উৎসব আয়োজন করে আসছে। এছাড়া তরুণ-তরুণীরা বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শাহবাগ, চারুকলা চত্বর, পাবলিক লাইব্রেরি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ধানমন্ডি লেক, বলধা গার্ডেন মাতিয়ে রাখে সারাদিন। দিনভর চলে তাদের বসন্তের উচ্ছ্বাস প্রকাশ। আর এখনকার সময়ে ফোন, ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলে বসন্তের শুভেচ্ছা বিনিময়। এভাবেই নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে বসন্তকে বরণ করে বাঙালি।

কবিতা



ফাগুনের ডাক

কায়নাত মারিয়া প্রাপ্তি

ফাগুন এল ফুলে ফুলে
রং লাগল গাছের ডালে
আগুন রাঙা শিমুল ফুলে
পলাশ দেখে উঠছে দুলে।

কোকিল ডাকে কুহু কুহু
মন যে মোর উড়ুউড়ু
মিষ্টি হাওয়া ছুঁয়ে যায়
মনটা যেন উড়তে চায়।

পাতা নড়ে ঝিরঝিরিয়ে
ফুলের ঘ্রাণ যায় বিলিয়ে
বসন্ত রং ছড়িয়ে যায়
সবার ঠোঁটে হাসি ফোটায়

নবম শ্রেণি, হাসান আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর

বসন্তের হাসি

কাজী জাবির আহমেদ

ফাগুন এল হাসি নিয়ে
রং ছড়াল চারদিকে
গাছে গাছে ফুলের মেলা
পাখিরা সব করে খেলা।

পলাশ লালে আগুন জ্বলে
শিমুল হাসে মাঠের কোণে
কোকিল ডাকে সারাক্ষণ
মনে জাগে শিহরণ।

এসো সবাই গাই গান
ফাগুন এল প্রাণে প্রাণ।

অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম

ফাগুন এল

রোকেয়া আক্তার (সাথি)

ফাগুন এল খেলার ছলে
রং ছড়াল গাছের ডালে
শিমুল ফুলের লাল রং
সবুজ পাতায় শিহরণ।

পলাশ হাসে দুলে দুলে
প্রকৃতি নাচে ফুলের দলে
কোকিল গায় সুরের গান
জাগিয়ে তোলে সবার প্রাণ।

ফাগুন এল আনন্দ নিয়ে
সবাই হাসে খুশি দিয়ে
ছোট্টরা সব মাঠে যায়
হাসির ঢেউ ছড়িয়ে বেড়ায়।

দশম শ্রেণি, মোরেলগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগেরহাট



সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৬-এ মালদ্বীপকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করে বাংলাদেশের নারী ফুটসাল দল।থাইল্যান্ডের হুয়া মাক ইনডোর স্টেডিয়ামে ২৪ শে জানুয়ারি থাইল্যান্ডে রাউন্ড রবিন লিগে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশের হাতে উঠে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি।

সাফ ফুটসালের প্রথম আসরেই ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপট ধরে রেখে চ্যাম্পিয়ন হয় সাবিনা খাতুনের দল।

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে আয়োজিত লিগ পদ্ধতির এই টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৬ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভুটানের পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১১।

ব্যাংককের নন্থাবুরি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ মাঠে নেমেছিল 'ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন' সমীকরণ নিয়ে। প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন সাবিনারা। কিন্তু ম্যাচে প্রথম গোলটা করেছে মালদ্বীপই।

তবে সমতাসূচক গোল পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি বাংলাদেশকে।

প্রথমার্ধেই ৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় বাংলাদেশ। বিরতির পর মালদ্বীপের জালে গোল উৎসব করে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে মালদ্বীপের মারিয়াম নূরা একটি সান্ত্বনামূলক গোল করলেও তা ব্যবধান কমানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। আসরে মোট ১৪ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছেন সাবিনা খাতুন।

[ফুটসাল মূলত ছোটো মাঠের খেলা। অনেকেই একে ইনডোর ফুটবল বলে থাকেন, তবে ফুটসাল শুধুই ফুটবলের একটি ছোটো সংস্করণ নয়, বরং এটি নিজেই একটি পূর্ণাঙ্গ খেলা, যার রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, নিয়ম, সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য।

ফুটবলের মতো এই খেলায়ও পাস, গোল, কৌশল সবই রয়েছে।তবে পরিবেশটা একটু ভিন্ন, নেই ঘাসের মাঠ, নেই বিশাল মাঠজুড়ে ছুটে চলা খেলোয়াড়দের দল। ফুটসাল খেলায় প্রতি দলে পাঁচজন খেলোয়াড় থাকেন, যার মধ্যে একজন গোলরক্ষক। ৪০ মিনিটের খেলায় যত খুশি খেলোয়াড় বদলানো যায়, ম্যাচে ব্যবহৃত বলটি ছোটো, শক্ত এবং কম লাফায়, যার ফলে বল নিয়ন্ত্রণ সহজ ও সূক্ষ্ম পাসের গুরুত্ব বাড়ে।

ফুটসালের জন্ম ১৯৩০ সালে উরুগুয়ের মোন্তেভিদেও শহরে।ফুটবলের মতো ফুটসালের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। বাংলাদেশে কিছু ক্লাব এবং একাডেমি রয়েছে যেখানে ফুটসাল খেলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা



রায়ানা সানিয়াত, দ্বিতীয় শ্রেণি, শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা



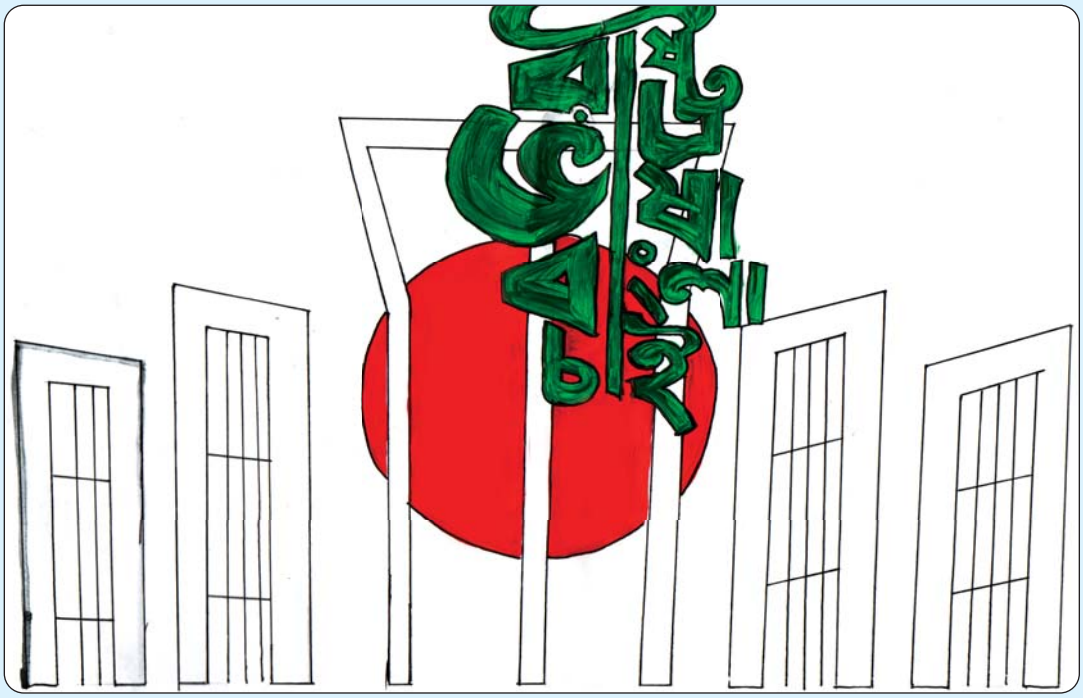
মেহরাব হাসান জারিফ, দ্বিতীয় শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



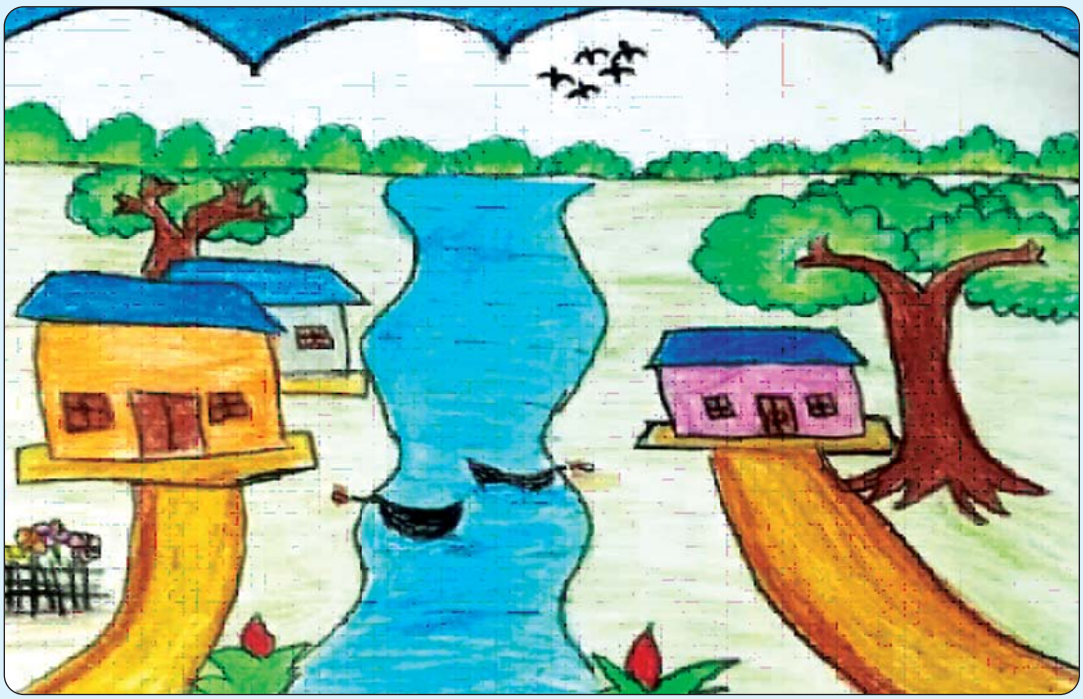
মো. সিয়াম হোসেন, ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা



রহমাতুল আলম, পঞ্চম শ্রেণি, শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

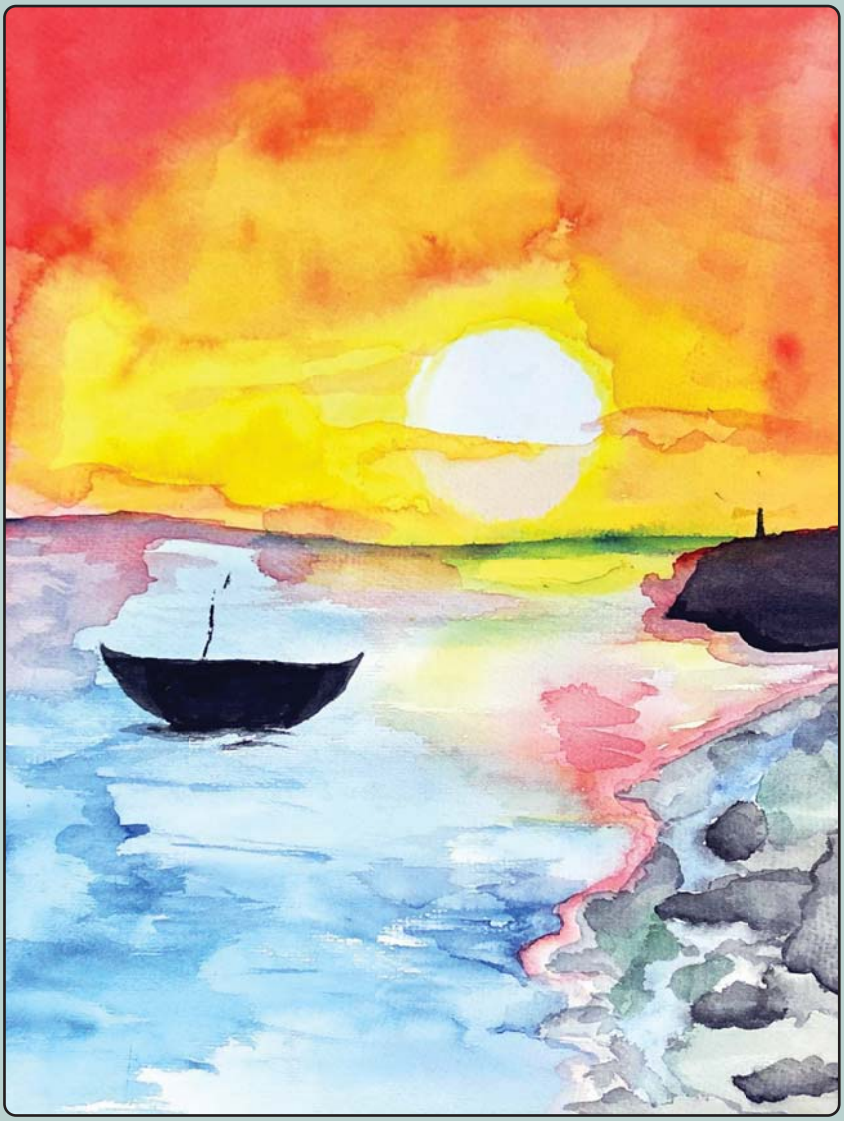


আবু হানিফ, অষ্টম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী বালক বিদ্যালয়, ঢাকা



তাসনিম জাহান রাদিয়া, তৃতীয় শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর।

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-8. February 2026, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



রুতবাহ জামান, অষ্টম শ্রেণি, কানাডিয়ান ট্রিলিনিয়াম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা